সহীহ হাদীসের আলোকে

তারাবীর রাকাআত সংখ্যা

ও

সহীহ হাদীসের আলোকে

ঈদের নামায

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

মারকাযুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়া ঢাকা

৩০/১২, পল্লবী, ঢাকা-১২১৬

প্রকাশক

আল-আবরার ট্রাস্ট

পাঠকবন্ধু মার্কেট, আন্ডার গ্রাউন্ড

৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

পরিবেশক

মাকতাবাতুল আশরাফ

(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের কথা

الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى

রমযান মুবারক কুরআন কারীমের মাস। দিনে রোযা এবং রাতে 'কিয়ামে রমযান' (তারাবীহ্) এ মুবারক মাসের মৌলিক আমল। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে এ মাস বান্দার জন্য ঈমান তাজা করার বিশেষ তোহ্ফা।

আফসোসের কথা হল, একদিকে ঈমানী দুর্বলতার কারণে বহু মানুষ এ মুবারক মাসেও গাফেল থাকে; অপরদিকে আমাদের কতিপয় ভাই এমন রয়েছেন, যারা নিজেদেরকে হাদীস মোতাবেক একমাত্র আমলকারী মনে করেন; কিন্তু দ্বীনের সঠিক বুঝের স্বল্পতার কারণে এবং হাদীসের সঠিক বুঝ পর্যন্ত পৌছতে না পারার কারণে তারা এ মুবারক মাসে গাফেলদের দাওয়াত দেওয়ার পরিবর্তে মুসল্লীদের অন্তরে ওয়াস্ওয়াসা দিতে লেগে যান।

অত্যন্ত পরিতাপের সাথে আমরা কয়েক বছর থেকে লক্ষ করছি যে, রমযান উপলক্ষে ফিললেটের মাধ্যমে তারাবীর রাকাআত-সংখ্যা এবং আরো কিছু বিষয় সম্পর্কে সাধারণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াস চালানো হয়। কখনো টাকার চ্যালেঞ্জও দেওয়া হয়। আবার লিফলেটগুলোও বিতরণ করা হয় এমন লোকদের মাঝে, যারা এর সত্যতা ও শুদ্ধতা যাচাইয়ে সক্ষম নয়।

এ দিকে মাহে রমযান শেষেই আসে ঈদুল ফিতর। এ ঈদেও আমাদের এই ভাইয়েরা মুসল্লীদেরকে স্বস্তিতে থাকতে দেন না। তারা এ কথা বলে বেড়ান যে, ঈদের নামাযের এই পদ্ধতি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়!! এটাকেও আজকাল লিফলেটবাজির বিষয় বানানো হচ্ছে!!

আল্লাহ তাআলা মাওলানা আবদুল মালেক সাহেবকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। তিনি বিষয় দুটি সম্পর্কে মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর মুখপত্র 'মাসিক আলকাউসার' অক্টোবর '০৫ঈ. সংখ্যায় বিস্তারিত ও প্রমাণভিত্তিক দুটি প্রবন্ধ লিখেছেন। এগুলো স্বতন্ত্র পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা আমরা সঙ্গত মনে করলাম, যাতে অপপ্রচারে আক্রান্তদের স্বস্তির উপায় হয় এবং সিরাতে মুস্তাকীমের উপর সুপ্রতিষ্ঠিতদের জন্য অধিক প্রশান্তির জরিয়া হয়।

আমাদের আনন্দের ব্যাপার যে, আল্লাহ তাআলা 'আলআবরার ট্রাস্ট'কে এই খেদমত আঞ্জাম দানের তাওফীক দিয়েছেন। পাঠকদের কাছে দরখাস্ত, প্রবন্ধকার ও প্রকাশক উভয়কেই আপনাদের দুআয় স্মরণ রাখবেন। বিশেষভাবে মাসিক আলকাউসার-এর জন্য দুআ করবেন, আল্লাহ তাআলা একে যেন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং এর উপকারিতা আরো ব্যাপকতর করেন। আমীন।

আরজগুজার

হাবীবুর রহমান খান

পরিচালক, আলআবরার ট্রাস্ট

৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা

০১/০৭/১৪২৮হি.

১৭/০৭/২০০৭ঈ.

সূচীপত্র

সহীহ হাদীসের আলোকে

তারাবীর রাকাআত সংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم

তারাবীর গুরুত্ব ও ফযীলত

হাদীস শরীফের ভাষ্য অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের সবচেয়ে পছন্দনীয় পন্থা হল ফরয ইবাদত ও ফরয দায়িত্বসমূহের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া। এরপরে সুন্নত ও নফলের স্থান। কিন্তু সুন্নত ও নফল দ্বারাও যে পর্যায়ের নৈকট্য লাভের কথা হাদীস শরীফে এসেছে তা-ও অন্তরকে জাগ্রত করার জন্য এবং মানবাত্মাকে ব্যাকুল করার জন্য যথেষ্ট। যার সারাংশ হল, ইখলাসের সাথে সুন্নত ও নফলসমূহের প্রতি মনোযোগী হলে এর মাধ্যমে বান্দার রুচি ও স্বভাব দুরস্ত হয়ে যায়। ফলে সর্বদা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনই তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হয়, তার প্রতিটি কাজকর্ম আল্লাহর আদেশ ও সন্তুষ্টির অনুগামী হয় এবং আল্লাহ তাকে এতটাই মহব্বত করতে থাকেন যে, তার ব্যাপারে ঘোষণা করে দেওয়া হয়– مَنْ عَادٰى لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ. "কেউ যদি আমার কোন বন্ধুর সাথে দুশমনি করে তো আমি তার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দিচ্ছি।" –সহীহ বুখারী ১১/৩৪০-৩৪১ (ফতহুল বারী) আলামুল হাদীস, খাত্তাবী ১/৭০১-৭০৩ মাজমূউল ফাতাওয়া ১৮/১২৯-১৩১

আর বাস্তব কথা হল, স্বভাব-রুচি দুরস্ত হওয়া এবং দৃষ্টিভঙ্গি বিশুদ্ধ হওয়ার চেয়ে বান্দার জন্য বড় কোন কামিয়াবি হতে পারে না। কেননা এই জিনিস দুনিয়া-আখেরাতের সকল কল্যাণের চাবিকাঠি।

রমযানুল মুবারক খায়ের ও বরকতের বসন্তকাল; বরং এর বাস্তব অবস্থা শব্দ ও বাক্যের গাঁথুনিতে প্রকাশ করা অসম্ভব। রমযানের দিনে আল্লাহ তাআলা কুরআন কারীমে নির্দেশ জারি করে রোযা ফরয করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যবানে রাতের 'কিয়াম' যাকে কিয়ামে রমযান বা তারাবীহ বলে, সুন্নত বানিয়েছেন। বিভিন্ন হেকমতের কারণে তারাবীর নামাযকে সুন্নতে মুয়াক্কাদাই রাখা হয়েছে, ফরয করা হয়নি; কিন্তু এতে সন্দেহ নেই যে, রমযানের উপকারিতা ও খায়ের-বরকত পূর্ণরূপে লাভ করতে হলে তারাবীর ব্যাপারে অবশ্যই যত্নবান হতে

হবে। এজন্য মুমিন বান্দা রমযান ও কুরআনের হক আদায় করার জন্য, রোযার উদ্দেশ্য-তাকওয়া হাসিলে সাহায্য পাওয়ার জন্য, আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ রহমত ও মাগফেরাতে সিক্ত হওয়ার জন্য, আল্লাহ্ তাআলার মহব্বতের হক আদায় করার জন্য সর্বোপরি আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য তারাবীর পাগল হয়ে থাকে। বিশ্বাসের সাথে ও সওয়াবের আশায় এবং বিনয় ও নম্রতার সাথে রমযানের রাতসমূহে (নামাযে) দাঁড়ানো ও সেজদার মধ্যে সময় কাটাতে থাকে এবং আল্লাহ্র সাথে দীর্ঘ আলাপচারিতার মাধ্যমে মহব্বতের পিপাসা নিবারণ করে হৃদয়ের তৃপ্তি আহরণ করে।

তারাবীর গুরুত্ব এ থেকেও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সুন্নত ও নফলের সাধারণ নিয়মের বাইরে এর মধ্যে ফরয নামাযের মত জামাআত বিধিবদ্ধ হয়েছে। তবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে জামাআতের ব্যবস্থা এজন্যই করেননি যে, তা আবার উম্মতের উপর ফরয হয়ে যায় কিনা। এ থেকে বোঝা যায়, তারাবীর মাকাম সাধারণ নফল থেকে অনেক উর্ধ্বে। মোটকথা, অনেক দলীলের ভিত্তিতে ফকীহগণ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, তারাবীর নামায সুন্নতে মুয়াক্কাদা। আজকাল কতিপয় মানুষ সাধারণ মুসলমানদেরকে একথা শিখাচ্ছে যে, তারাবীহ অন্যসব নফলের মতই। এটা না পড়লেও কোন গুনাহ নেই। এ ধরনের মিথ্যা প্রোপাগান্ডায় প্রভাবান্বিত হয়ে নিজেকে বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করবেন না। রমযানের রাতগুলোকে মহাসুযোগ মনে করে গুরুত্বের সাথে তারাবীর নামাযে যত্নবান থাকুন এবং শেষরাতে তাহাজ্জুদ নামাযের ব্যাপারে (যা সারা বছরের নামায) যত্নবান হওয়ার চেষ্টা করুন।

তারাবীর রাকাআত-সংখ্যা

ইংরেজজাতির অভিশপ্ত কদম এই ভূখণ্ডে পড়ার আগে এ বিষয়ে কোন কিছু বলা বা লিখার প্রয়োজন হত না। কেননা গোটা ইসলামী দুনিয়ায়, পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত, সাহাবী তাবেয়ীগণের স্বর্ণযুগ থেকে চলে আসা নিয়ম অনুযায়ী প্রতি মসজিদে বিশ রাকাআত তারাবীহ্ ও বিতরের নামায পড়া হত।

কোন কোন মসজিদে কোন সময় বিশ রাকাআতের অধিকও পড়া হত; কিন্তু বিশ রাকাআতের কম তারাবীর নামায কোন মসজিদে হত এর কোন প্রমাণ কেউ দেখাতে পারবে না।

যখন থেকে ইংরেজের অভিশপ্ত কদম এঅঞ্চলে পড়েছে তখন থেকেই কিছু কিছু 'আত্মারোগী' বা স্বল্পজ্ঞানী ও স্বল্প বুঝের ব্যক্তি যারা সচেতনভাবে বা অসচেতনভাবে ইংরেজের খুঁটি মজবুত করার কাজ করে যাচ্ছিলেন তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে ছিলেন আমাদের ওই সব বন্ধুবর্গ যাদের মূল মিশনের মৌলিক বিষয়াদির মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়

দুটি অন্যতম ঃ

১. ইসলামের স্বর্ণযুগ তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবেতাবেয়ীনের যুগ থেকে অবিচ্ছিন্ন কর্মপরম্পরা এবং ইজমায়ে উম্মতের বিপরীতে বহুদিন আগে পরিত্যক্ত কিছু 'শায', 'মুনকার'(ভ্রান্ত ও বিচ্যুত) মতের পুণর্জীবন দিয়ে কিংবা প্রয়োজনে এ ধরনের ভ্রান্তমতের নতুন জন্ম দিয়ে সাধারণ মুসলমানকে পেরেশান করা এবং তাদের একতা, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতিকে চুরমার করা। আর সেসব মতগুলোকে 'হাদীস-অনুসরণ' নামে চালিয়ে দেওয়া। এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শায ও মুনকার রেওয়ায়াত খুঁজে খুঁজে বের করে সেসবকে বিশুদ্ধ ও বাস্তবক্ষেত্রে অনুসৃত সাব্যস্ত করার অপচেষ্টা এবং কিছু সহীহ হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা করে সেসবের পক্ষে প্রমাণ যোগানোর ব্যর্থ প্রচেষ্টা করা।

২. সেসব শাখাগত মাসায়েলকে পরস্পরের বিবাদ-বিসংবাদ এবং একে অপরকে ফাসেক ও কাফের আখ্যা দেওয়ার উপায় বানানো যেখানে সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকেই একাধিক মত চলে আসছে এবং প্রত্যেক মতের সপক্ষে হাদীস ও সুন্নতে নববীর সমর্থন বিদ্যমান রয়েছে। আমাদের পূর্বসূরিদের মধ্যে এসব মাসাআলায় মতানৈক্য ছিল; কিন্তু এতে তাদের ঐক্যবদ্ধতায় কোন প্রভাব পড়েনি। একে অপরকে ফাসেক ও গোমরাহ আখ্যা দেওয়া তো দূরের কথা, পরস্পরের সৌহার্দ্য-সম্প্রীতিতেও কোন ফাটল ধরেনি। কেননা তাঁরা বুঝতেন, শরীয়তসম্মত ও দলীলভিত্তিক ইখতেলাফ যেখানে হয় সেখানে প্রত্যেকে নিজ নিজ ইজতিহাদ ও সিদ্ধান্তের উপর স্থির থাকাটাই শরীয়তে কাম্য। শাখাগত বিভিন্ন মাসায়েলের ব্যাপারে সালাফের (পূর্বসূরিদের) এই সম্মিলিত কর্ম-পদ্ধতিকে পরিহার করে মসজিদগুলোকে বিবাদ-বিসংবাদের আখড়ায় পরিণত করা সে সব বন্ধুদের মিশনের দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল।

আমাদের আলোচ্যবিষয় অর্থাৎ তারাবীর মাসাআলাটি তাদের মিশনের প্রথম বিষয়টির অন্তর্ভুক্ত। খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ থেকে মুসলিম উম্মাহর সম্মিলিত ও অবিচ্ছিন্ন কর্ম-পরম্পরার বিপরীতে ইংরেজশাসিত তৎকালীন বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশে যে আওয়াজ উঠেছিল তা এক লা-মাযহাবী আলেমের পক্ষ থেকেই উঠেছিল, যে ইংরেজদের থেকে নিজ জামাআতের নাম আহলে হাদীস মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলার খাস রহমত, তাদেরই দলভুক্ত এক আলেম মাওলানা গোলাম রাসূল ১২৯০ হিজরীতেই তার দলীলভিত্তিক খণ্ডন লিখেছিলেন। যেখানে ২০ রাকাআত তারাবীর অন্যান্য দলীলের পাশাপাশি উম্মতের এই সম্মিলিত ও অবিচ্ছিন্ন কর্মধারার বিষয়টিও উল্লেখ রয়েছে। 'রেসালায়ে তারাবীহ' নামে প্রকাশিত কিতাবটির কপি আমাদের কাছেও রয়েছে।

আরব জাহানে কবে থেকে এই বেদআতের সূচনা তা সুনির্দিষ্টভাবে আমার জানা না

থাকলেও এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সেসব অঞ্চলে এর সূচনা ভারতবর্ষের পরে হয়েছে। আমার জানা মতে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি এই বেদআতকে দলীল দ্বারা মজবুত করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন তিনি হলেন শায়খ নাসীব রেফায়ী। তখন আলেমগণ তার মতামত ও আলোচনাকে খণ্ডন করছেন শায়খ আলবানী মরহুমের সেটা সহ্য হয়নি। তিনি রেফায়ী সাহেবের সমর্থনে ১৩৭৭ হিজরীতে 'তাসদীদুল ইসাবাহ' নামে এক বই লিখে দিলেন। বইটি তার ভ্রান্তি-বিচ্যুতি এবং মুসলিম উম্মাহ ও মুসলিম উম্মাহর ইমামগণের প্রতি বিদ্রোহ-বিদ্বেষের একটি খোলা দলীল এবং ইলমে উসূলে হাদীস ও জারহ-তাদীল বিষয়ে তার অপরিপক্কতার জ্বলন্ত প্রমাণ। এ ছাড়া ইলমে উসূলে ফিকহের মধ্যেও তার যে দৈন্যদশা তাও এ বইটিতে পরিস্ফুট হয়ে গেছে। যা সত্যিই মর্মান্তিক। এসব সমস্যা থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশের লা-মাযহাবী বন্ধুরা তারাবীর মাসআলাতে শায়খ আলবানীর সেই বইটিকেই 'গলার মালা' বানিয়ে রেখেছেন।

এখানে যে বাস্তবতার দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তাহল, শায়খ নাসীব রেফায়ীর খণ্ডনে লিখিত الإِصَابَةُ فِيْ الاِنْتِصَارِ لِلْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَالصَّحَابَةِ. নামক কিতাবটির ৬১ নং পৃষ্ঠায় যখন লেখা হল– وَلَمْ يَشُذَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِمَنْعِهَا غَيْرُ هٰذِهِ الشِّرْذِمَةِ الَّتِيْ ظَهَرَتْ فِيْ زَمَانِنَا كَالشَّيْخِ نَاصِرِ وَإِخْوَانِهِ. "শায়খ নাসির (আলবানী) ও তাঁর সমমনা ব্যক্তিদের মত লোকদের ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠী ছাড়া, যারা আমাদের এই যুগে আত্মপ্রকাশ করেছে, আর কেউই একে অস্বীকার করে ভ্রান্তি ও বিচ্যুতিতে নিপতিত হয়নি।"

আপনি আশ্চর্য হবেন যে, তখন তার জবাবে শায়খ আলবানীর পক্ষে কোন সাহাবী, কোন তাবেয়ী, কোন ফকীহ ইমাম বা কোন মুহাদ্দিস ইমামের নাম উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি যে, যিনি বিশ রাকাআত তারাবীর ব্যাপারে আপত্তি করেছেন। অনুরূপ কোন মসজিদের নাম নেওয়াও তার পক্ষে সম্ভব হয়নি যে, অমুক ঐতিহাসিক মসজিদে তারাবীর নামায বিশ রাকাআত নয়, আট রাকাআত হত! তবে ইলমের আমানতদারি ক্ষুণ্ন করে তিনি ইমাম মালেক রহ.এর নাম নিয়ে বসেন যে, ইমাম মালেক রহ. নাকি বিশ রাকাআত তারাবীর নামায পড়তে নিষেধ করতেন! 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া-ইন্না ইলাইহি রাজিঊন' অথচ ইমাম মালেক রহ.এর মাযহাবের মৌলিকগ্রন্থ 'আলমুদাওওনা' যা ইমাম মালেক রহ.এর ছাত্রদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়েছে তাতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, তারাবীর নামায বিতরের তিন রাকাআতসহ সর্বমোট ৩৯ রাকাআত এবং তৎকালীন মদীনার আমীর তারাবীর রাকাআত সংখ্যা কমাতে চাইলে মালেক রহ. তাকে নিষেধ করেন। –আলমুদাওওনাতুল কুবরা ১/১৯৩

আরো দেখা যেতে পারে মালেকী মাযহাবের কিতাব আলইসতিযকার ৫/১৫৭; বিদায়াতুল মুজতাহিদ ১/২৪৬; আল মুনতাকা ১/২০৮-২১০

এসব কিছুকে ছেড়ে শায়খ আলবানী মরহুম, ইমাম মালেক রহ.এর সাথে এই কথার সম্বন্ধ করে দিলেন যে, তিনি বিশ রাকাআত তারাবী থেকে নিষেধ করতেন। দলীল কী?! দলীল হল জুরী নামক জনৈক শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ব্যক্তি ইমাম মালেক রহ.এর ব্যাপারে এই কথা বলেছেন। অথচ শায়খ আলবানী খুব ভালভাবেই জানেন যে, এই জুরী যে কে তার কোন ঠিকানাই পাওয়া যায় না। তবে এতটুকু পরিষ্কার যে এই ব্যক্তি ইমাম মালেক রহ.এর অনেক পরের লোক। অথচ ইমাম মালেক রহ. পর্যন্ত না কোন সনদের উল্লেখ আছে, আর না মধ্যবর্তী কোন ব্যক্তির উদ্ধৃতি!

বিষয় হল, মালেকী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য হাদীস-ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহ, ফিক্হ ও ফাতাওয়ার মৌলিক কিতাবসমূহ পরিত্যাগ করে; বরং এসব কিছুর বিবরণের বিপরীতে এক মাজহুল-অজানা অচেনা লোকের বর্ণনার ভিত্তিতে ইমাম মালেক রহ.কে নিজের অনুসরনীয় ব্যক্তি সাব্যস্ত করার চেষ্টা করা তাও আবার (নাউযুবিল্লাহ) বিশ রাকাআত তারাবীর উপর আপত্তি করার এই বেদআতের ব্যাপারে, এটা কোন ধরনের দিয়ানতদারি আর কী ধরনের আমানতদারি! অথচ ইমাম মালেক রহ.এর যুগ কেন তাঁর পরে শতশত বছর পর্যন্ত এই বেদআতের কোন অস্তিত্বই ছিল না।

মোটকথা, এই বিশৃঙ্খল-পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার আগ পর্যন্ত শুধু আট রাকাআত তারাবীর কোথাও কোন অস্তিত্ব ছিল না। সাহাবা-যুগ, তাবেয়ী-যুগ, তাবেতাবেয়ী-যুগ এবং এরপরে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত হাদীস বা ফিকহের কোন ইমাম থেকে একথা দেখানো সম্ভব নয় যে, তারাবীর নামায শুধু আট রাকাআত যথেষ্ট, বিশ রাকাআত পড়ার কোন প্রয়োজন নেই অথবা নাউযুবিল্লাহ, আট রাকাআতের চেয়ে বেশি পড়া বেদআত যা আজকালের কিছু সালাফী ও অধিকাংশ লা-মাযহাবীর বক্তব্য।

বর্তমান শতাব্দীতে হিন্দুস্তানের সবচেয়ে বড় মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান আজমী রহ. 'রাকাআতে তারাবীহ' –তারাবীর রাকাআত-সংখ্যা নামে একটি গবেষণাধর্মী কিতাব লিখেছেন যা ১৩৭৭ হিজরীতে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি সাহাবা-যুগ থেকে নিয়ে লা-মাযহাবীদের এই ইজমা-বিরোধী মতের উদ্ভাবনের আগ পর্যন্ত দীর্ঘ সাড়ে বারোশ বছরের আমলে মুতাওয়ারাস–উম্মাহর সম্মিলিত অবিচ্ছিন্ন কর্ম-ধারা একেক শতাব্দী করে দেখিয়েছেন যে, তারাবীর নামায আট রাকাআতে সীমাবদ্ধ রাখা এবং বিশ রাকাআতের উপর আপত্তি করার এই মতবাদ পেছনের শতাব্দীগুলোতে ছিল না। এটা লা-মাযহাবীদের আবিষ্কার। আজমী রহ.এর কিতাবটি প্রকাশিত হওয়ার পর প্রায় অর্ধ-শতাব্দী অতিবাহিত হয়ে গেছে কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন লা-মাযহাবীর পক্ষে এটি খণ্ডন করা সম্ভব হয়নি। আর সম্ভবও নয়।

তারাবীর নামায বিশ রাকাআত হওয়ার দলীল

ভূমিকা ঃ (১) শরীয়তের সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে বড় দলীল হল কুরআন কারীম। এরপর সুন্নাহর স্থান। কিন্তু সুন্নাহর ব্যাপারে কতিপয় মানুষের এই ধারণা আছে যে, যেসব হাদীস সুস্পষ্টভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা বা কাজ হিসাবে সহীহ বর্ণনা-পরম্পরায় এসেছে শুধু তাই সুন্নাহ। এই ধারণা ঠিক নয়। সুন্নাহ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা ও নির্দেশনাবলির নাম। এই শিক্ষা ও নির্দেশনা আমাদের কাছে সাধারণত মৌখিক বর্ণনা-পরম্পরার মাধ্যমেই পৌছে থাকে এবং সাধারণ পরিভাষায় এইসব মৌখিক বর্ণনাসূত্রে প্রাপ্ত রেওয়ায়াতগুলোকেই 'হাদীস' বলা হয়। কিন্তু অনেক সময় এমন হয় যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ কোন শিক্ষা বা নির্দেশনা আমাদের কাছে মৌখিক বর্ণনার স্থলে কর্মের ধারাবাহিকতায় পৌছে। অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম নবীজী থেকে কর্মের মাধ্যমে তা গ্রহণ করেছেন, তাদের নিকট থেকে তাবেয়ীগণ এবং তাদের নিকট থেকে তাবেতাবেয়ীগণ গ্রহণ করেছেন। এভাবে প্রত্যেক উত্তরসূরি তার পূর্বসূরি থেকে কর্মের মধ্য দিয়ে নবীজীর সেই শিক্ষাকে গ্রহণ করেন। নবী-শিক্ষার এই প্রকারটিকে পরিভাষায় 'আমলে মুতাওয়ারাস' বা সুন্নতে মুতাওয়ারাসা বলা হয়।

নবী-শিক্ষা ও নবী-নির্দেশনার অনেক বিষয় এই পথেই পরবর্তীদের নিকটে পৌছেছে। এই সব শিক্ষা-নির্দেশনা যদি মৌখিক বর্ণনাসমূহের মধ্যেও তালাশ করা হয় তাহলে অনেক সময় এমন হয় যে, হয়ত এ ব্যাপারে কোন মৌখিক বর্ণনা পাওয়া যায় না অথবা পাওয়া গেলেও সনদের দিক থেকে তা হয় যয়ীফ। এস্থানটিতে এসে স্বল্প-জ্ঞান কিংবা স্বল্প-বুঝের লোকেরা বিভ্রান্ত হয়। তারা যখন বিশুদ্ধ মৌখিক বর্ণনাসূত্রে এই বিষয়টি খুঁজে পায় না তো ফস করে নবীজীর এই শিক্ষাটিকেই অস্বীকার করে বসে। অথচ মৌখিক সাধারণ বর্ণনা-ধারার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী তাওয়ারুস তথা ব্যাপক ও সম্মিলিত কর্মধারার মাধ্যমে বিষয়টি সংরক্ষিত।

২. অনুরূপ নবী-শিক্ষার একটি অংশ হল যা আমাদের কাছে সাহাবায়ে কেরামের শিক্ষা-নির্দেশনার মধ্য দিয়ে সংরক্ষিত আছে। বিষয়টি একটু খোলাসা করে বলি। সাহাবায়ে কেরামের অনেক নির্দেশনা এমন আছে যার ভিত্তি শরীয়তসম্মত কিয়াস ও ইজতিহাদের উপর। এগুলো শরীয়তের দলীল হিসেবে স্বীকৃত। আবার তাদের কিছু নির্দেশনা ও কিছু ফাতাওয়া এমন আছে যা তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন কথা বা কাজ থেকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু অন্যকে শিখানোর সময় এর উদ্ধৃতি দেওয়ার প্রয়োজন বোধ হয়নি। কেননা প্রেক্ষাপট থেকে এ কথা স্পষ্ট ছিল যে, তাঁরা নবীজীর শিক্ষা ও নির্দেশনার ভিত্তিতেই এ বিষয়টি শিক্ষা দিচ্ছেন। এজন্য

দ্বীনের ইমামগণের সর্বসম্মত নীতি হল, সাহাবায়ে কেরামের যে ফাতাওয়া বা নির্দেশনার ব্যাপারে এটা সুনির্দিষ্ট হয় যে, এটা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা-নির্দেশনা থেকেই গ্রহণকৃত, এতে সাহাবীর ইজতিহাদ বা কিয়াসের কোন প্রভাব নেই তা মারফূ হাদীসেরই অন্তর্ভুক্ত। কোন মাসআলায় এর মাধ্যমে প্রমাণ দেওয়া মারফূ হাদীস দ্বারা প্রমাণ দেওয়ার শামিল। পরিভাষায় একে মারফূ হুক্‌মী বলা হয়। নিঃসন্দেহে এর ভিত্তি কোন মারফূ হাকীকী বা স্পষ্ট মারফূর উপর। তবে এটা জরুরি নয় যে, হাদীসের কিতাবসমূহে সেই স্পষ্ট মারফূ হাদীসটি সহীহ সনদে বিদ্যমান থাকবে। এ স্থানটিতে এসেও স্বল্প-বুঝের লোকেরা পদস্খলনের শিকার হয় এবং নবীজীর এই শিক্ষাটিকেই অস্বীকার করে বসে এবং বলতে থাকে যে, এর কোন ভিত্তি পাওয়া গেল না, অথচ মারফূ হুকমীর সূত্রে প্রমাণিত হওয়াও দলীল হিসাবে যথেষ্ট।

৩. সহীহ হাদীসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন সুন্নতের পাশাপাশি খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতকে অনুসরণ করার এবং তাকে মজবুতভাবে অবলম্বন করার আদেশ করেছেন। ইরশাদ করেছেন–

إِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِيْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ....، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

"মনে রেখো! আমার পরে তোমাদের যারা জীবিত থাকবে তারা বহু মতানৈক্য দেখতে পাবে। তখন আমার সুন্নত ও আমার হেদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাগণের সুন্নতকে আকড়ে রাখবে। একে অবলম্বন করবে এবং মাড়ির দাঁত দিয়ে প্রাণপণ করে কামড়ে রাখবে ... এবং তোমরা (ধর্মীয় বিষয়ের) নবআবিষ্কৃত বিষয়াদি থেকে খুব সতর্কতার সাথে বেঁচে থাকবে। কেননা প্রতিটি নবআবিষ্কৃত বিষয় বেদআত। আর প্রতিটি বেদআত হল গোমরাহী।" –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৬০৭; জামে তিরমিযী ৫/৪৩; হাদীস ২৬৭৬; মুসনাদে আহমদ ৪/১২৬, হাদীস ১৬৬৯২; সুনানে ইবনে মাজা, হাদীস ৪২; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৫

জামে তিরমিযীর ২২২৬ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পরে খেলাফতের মেয়াদ ত্রিশ বছর হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী খোদ নবীজীই করে গেছেন। সে হিসেবে নবী-পরিভাষায় খুলাফায়ে রাশেদীন চারজন– ১. আবু বকর রা. ২. উমর রা. ৩. উসমান রা. ৪. আলী রা.। আলী রা.এর শাহাদত ৪০হিজরীর রমযানে হয়েছে।

যেহেতু খুলাফায়ে রাশেদীনের ব্যাপারে ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা জেনেছিলেন যে, তাঁদের জারিকৃত সুন্নতসমূহ নবী-শিক্ষার

উপরই ভিত্তিশীল হবে, তাঁদের সুন্নতসমূহ নববী-সুন্নতেরই অনুগামী হবে এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি মোতাবেক হবে এজন্য রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে ব্যাপক ঘোষণা দিয়ে যান যে, তোমরা খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতকে মজবুতভাবে আকড়ে রাখবে। সুতরাং যখন উম্মতের সামনে কোন বিষয়ে এটা প্রমাণ হয়ে যাবে যে, এটি চার খলীফার কোন একজনের সুন্নত তখন তার অনুসরণের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত ইরশাদটিই যথেষ্ট। আমাদের জন্য আরো অগ্রসর হয়ে এটা ভাবার প্রয়োজন নেই যে, তাঁদের এই সুন্নতের ভিত্তি কী ছিল এবং তাঁরা এই সুন্নত কোন নবী-শিক্ষা থেকে গ্রহণ করেছেন। এখানেও স্বল্প-জ্ঞান ও স্বল্প-বুঝের লোকদের অভ্যাস হল, খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতের ভিত্তি হাদীসের কিতাবসমূহে খুঁজতে থাকেন। এরপর যদি তারা সহীহ সনদে নবীজীর স্পষ্ট কোন বাণী বিশেষ এই ব্যাপারে না পায় তখন তাকে অস্বীকার করে বসে এবং অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে একে বেদআত আখ্যা দিয়ে দেয়। অথচ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিন্দিত ইখতিলাফ থেকে বাঁচার এই পথই দেখিয়েছেন যে, আমার সুন্নত ও আমার খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতকে মজবুতভাবে অবলম্বন কর এবং এই দুই সুন্নতকে মজবুতভাবে অবলম্বন করার আদেশ দেওয়ার পর বলেছেন, 'বেদআত থেকে বেঁচে থাক। কেননা প্রত্যেক বেদআত গোমরাহী।' একটু চিন্তা করুন, যদি খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত বেদআতই হত তাহলে নবীজীর এই ইরশাদের কোন অর্থ থাকে কি?

৪. 'সুন্নাহ'র পরে শরীয়তের তৃতীয় বুনিয়াদি দলীল হল ইজমা। এর বিভিন্ন ধরন এবং অনেকগুলো পর্যায় রয়েছে। এর মধ্যে সর্বপ্রধান ও সর্বউন্নত হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহাজির-আনসার এবং অন্যান্য সাহাবীগণের ইজমা। এই ইজমা যদি ব্যাপকভাবে এবং অবিচ্ছিন্ন ও সম্মিলিতরূপে আমাদের পর্যন্ত পৌছে তবে তা শরীয়তের অনেক বড় অকাট্য দলীল। এ দলীল থাকা অবস্থায় অন্য কোন দলীলের প্রয়োজন নেই এবং ইজমাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করার জন্য এরও প্রয়োজন নেই যে, এই ইজমা কীসের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়েছে তার অনুসন্ধানে নেমে পড়া। কেননা শরীয়ত নিজেই ইজমাকে দলীল সাব্যস্ত করেছে এবং যাঁদের মাধ্যমে ইজমাসম্পন্ন হয় তাঁদের ব্যাপারে আমাদেরকে আশ্বস্ত করে দিয়েছে যে, এঁরা কখনো গোমরাহীর ব্যাপারে একমত হতে পারে না। কুরআন কারীমে তো সুস্পষ্টভাবে মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণের অনুসরণের আদেশ করা হয়েছে এবং সাবীলুল মুমিনীন (মুমিনদের অনুসৃত পথ) থেকে বিমুখ হওয়াকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ ঘোষণা করেছে।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের মত, পথ ও রুচির সাথে একাত্মতা পোষণ করে না এমন ব্যক্তিদের অভ্যাস হল তারা কোন মাসআলাতে শুধু উম্মতের ফকীহবৃন্দ নয়,

উম্মাহর শীর্ষ ব্যক্তিবর্গ–সাহাবায়ে কেরাম বিশেষত মুহাজির ও আনসারের ঐকমত্য বিদ্যমান থাকা অবস্থায় ভিন্ন দলীল তালাশ করতে থাকে। অথচ শরীয়ত এই ইজমাকে দলীল সাব্যস্ত করেছে। কিন্তু ওই সব বন্ধুরা যদি শরীয়তের এই দলীলটির সমর্থনে অন্য কোন সহীহ্ সনদওয়ালা স্পষ্ট হাদীস না পায় তাহলে এই মাসআলাটিকে অস্বীকার করে দেয়। কেউ তো আরো এক ধাপ বেড়ে অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার সাথে শরীয়তের দলীল ইজমাকেই অস্বীকার করে বসে!

মনে রাখবেন, এ সব কিছুই হল মূর্খতা শরীয়তের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করার সমার্থক। যদিও তা অসচেতনভাবেই হোক না কেন। অর্থাৎ শরীয়ত যে বিষয়টিকে দলীল সাব্যস্ত করেছে তারা তাকে মেনে নিতে পারছেন না।

তারাবীর রাকাআত সংখ্যা বিষয়ক মাসআলাটি উপরোক্ত সকল দলীল দ্বারাই প্রমাণিত। অর্থাৎ 'খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত', 'মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণের ইজমা', 'মারফূ হুক্মী', 'সুন্নতে মুতাওয়ারাসা' এবং 'ফুকাহায়ে কেরামের ইজমা'-এর প্রত্যেকটি দলীল দ্বারাই প্রমাণিত যে, তারাবীর নামায আট রাকাআতে সীমাবদ্ধ মনে করা এবং বিশ রাকাআত মাসনূন হওয়াকে অস্বীকার করা একটি মারাত্মক ভুল। সবশেষে এই মাসআলাতে একটি স্পষ্ট মারফূ হাদীসও আছে, যা উপরোক্ত দলীলসমূহের ভিত্তিতে প্রামাণ্য ও গ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত হয়। এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে বেশি আলোচনা করা তো সম্ভব নয়, তারাবীহ্ সংক্রান্ত স্বতন্ত্র কোন কিতাবে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে। এখানে আমি সংক্ষেপে উপরোক্ত দলীলসমূহের প্রতি অনেকটা ইঙ্গিত করেই চলে যাব।

প্রথম দলীল ঃ খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত

সহীহ বুখারী (হাদীস ২০১০, কিতাবু সালাতিত তারাবীহ) এবং অন্যান্য হাদীসের কিতাবে এ বিষয়টি সহীহ্ সনদে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো তারাবীর নামায জামাআতে পড়িয়েছেন। আবার কখনো এমন হয়েছে যে, কয়েক রাকাআত জামাআতের সাথে পড়ে হুজরায় চলে গেছেন এবং একাকী নামাযে রত থেকেছেন। –মুসলিম, হাদীস ১১০৪

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিত জামাআত পড়াননি; বরং অধিকাংশ সময় একাকীই পড়তেন। তিনি নিজে কেন জামাআতের নিয়ম করেননি তা উম্মতকে বলে গেছেন যে, (যেহেতু উম্মতের মধ্যে তাঁর উপস্থিতির সময়টি ওহী অবতীর্ণ হওয়া এবং শরীয়তের বিধানসমূহ বিধিবদ্ধ হওয়ার সময় ছিল, তাই) জামাআতের সাথে নিয়মিত নামায পড়লে এ নামাযটিও উম্মতের উপর ফরয হয়ে যাওয়ার আশংকা ছিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এবং তাঁর পরে প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.এর খেলাফতকালে ও উমর রা.এর খেলাফতের শুরুতে এই অবস্থাই ছিল। অর্থাৎ এক ইমামের পেছনে ফরয নামাযের মত তারাবীর নামায জামাআতের সাথে আদায় করার ইহতেমাম ছিল না।

রমযানের কোন এক রাতে উমর রা. মসজিদে তাশরীফ নিয়ে যান এবং সেখানে দেখতে পান যে, মসজিদের বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট জামাআত হচ্ছে। তিনি চিন্তা করলেন সকল নামাযীকে এক ইমামের পেছনে একত্র করে দেওয়া উচিত। তখন তিনি এই আদেশ জারি করেন এবং উবাই ইবনে কা'ব রা.কে ইমাম বানিয়ে দেন। –সহীহ বুখারী, হাদীস ২০১০

এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহ. (মৃত্যু ৪৬৩ হি.) মুয়াত্তা মালেকের অতুলনীয় ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আত্তামহীদ'এ বলেন, "উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এখানে নতুন কোন কিছু করেননি। তিনি তা-ই করেছেন যা খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করতেন; কিন্তু শুধু এই আশংকায় যে, নিয়মিত জামাআতের কারণে তারাবীর নামায উম্মতের উপর ফরয হয়ে যায় কিনা, নিজে জামাআতের ব্যবস্থা করেননি। উমর রা. এই বিষয়টি জানতেন। তিনি দেখলেন, নবীজীর ইন্তেকালের পর এখন আর এই ভয় নেই। (কেননা ওহীর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে এবং শরীয়ত-নির্ধারণের বিষয়টি সম্পন্ন হয়ে গেছে।) তখন তিনি নবী-পছন্দের অনুসরণ করে ১৪ হিজরীতে জামাআতের ব্যবস্থা করে দেন। আল্লাহ তাআলা যেন এই মর্যাদা তাঁর জন্যই নির্ধারিত রেখেছিলেন। আবু বকর সিদ্দীক রা.এর মনে এ বিষয়টি উদিত হয়নি। যদিও সামগ্রিকভাবে তিনিই উত্তম ও অগ্রগণ্য ছিলেন।" –আত্তামহীদ ৮/১০৮-১০৯

এতদিন পর্যন্ত তারাবীহ একটি ব্যক্তিগত পর্যায়ের আমল ছিল। জামাআত হলেও প্রত্যেকে পুরো তারাবীহ জামাআতেই পড়বেন এর কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। তাই তারাবীর রাকাআত-সংখ্যার ব্যাপারে বিশেষ আলোচনার পরিবেশই সেটা ছিল না। কিন্তু যখন মসজিদে নববীতে গুরুত্বের সাথে পুরো তারাবীহ একই ইমামের পেছনে প্রতিদিন হতে আরম্ভ করে এবং শত শত মানুষের উপস্থিতিতে হতে থাকে তখন তারাবীর রাকাআত-সংখ্যা আর কোন গোপন বিষয় থাকেনি। এখন সবাই প্রকাশ্যেই দেখতে পাচ্ছিলেন, তারাবীর নামায কত রাকাআত এবং সাহাবায়ে কেরাম এতদিন পর্যন্ত কত রাকাআত পড়তেন। এবার দেখার বিষয় হল, সে সময় মসজিদে নববীতে তারাবীর নামায কত রাকাআত পড়া হত।

আপনি সহীহ হাদীসের নির্ভযোগ্য কিতাবসমূহের পাতা উল্টাতে থাকুন, সহীহ এবং মুতাওয়াতির– অসংখ্য সূত্রে বর্ণিত– রেওয়ায়াতের এক বিশাল ভাণ্ডার আপনি পেয়ে

যাবেন। যেখানে দেখতে পাবেন যে, আশারায়ে মুবাশশারা– জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবী– (আবু বকর সিদ্দীক রা. ছাড়া। কেননা তিনি তখন জীবিত ছিলেন না) মুহাজির ও আনসারী সাহাবীবৃন্দ এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের জীবদ্দশায় তারাবীর নামায বিশ রাকাআত এবং সবশেষে তিন রাকাআত বিতর পড়া হত। কয়েকটি রেওয়ায়াত দেখুন।

খলীফায়ে রাশেদ হযরত উমর ফারূক রা.এর যুগ

১. ইয়াযীদ ইবনে খুসায়ফা রহ.এর বিবরণ

ইয়াযীদ ইবনে খুসায়ফা রহ. বলেন, হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ রা. বলেছেন–

كَانُوْا يَقُوْمُوْنَ عَلٰى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً. قَالَ: وَكَانُوا يَقْرَؤُوْنَ بِالْمِئِيْنَ، وَكَانُوْا يَتَوَكَّؤُوْنَ عَلٰى عِصِيِّهِمْ فِيْ عَهْدِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مِنْ شِدَّةِ الْقِيَامِ.

"তাঁরা (সাহাবা ও তাবেয়ীন) উমর ইবনুল খাত্তাব রা.এর যুগে রমযান মাসে বিশ রাকাআত পড়তেন। তিনি আরো বলেছেন যে, তাঁরা নামাযে শতাধিক আয়াত বিশিষ্ট সূরাসমূহ পড়তেন এবং উসমান ইবনে আফফান রা.এর যুগে দীর্ঘ নামাযের কারণে তাঁদের (কেউ কেউ) লাঠিসমূহে ভর দিয়ে দাঁড়াতেন।" –আস্সুনানুল কুবরা, বায়হাকী ২/৪৯৬

২. সাহাবী সায়েব ইবনে ইয়াযীদ রা.এর অন্য আরেকটি বিবরণ হল–

كُنَّا نَقُوْمُ فِيْ زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَالْوِتْرَ.

"আমরা উমর ইবনুল খাত্তাব রা.এর যুগে বিশ রাকাআত এবং বিতর পড়তাম।" –আস্সুনানুল কুবরা, বায়হাকী ১/২৬৭-২৬৮; মারিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার, বায়হাকী ২/৩০৫

সায়েব ইবনে ইয়াযীদ রা.এর এই হাদীসটির সনদ সহীহ। অনেক হাদীসের ইমাম ও ফিক্হের ইমাম এই হাদীস থেকে প্রমাণ গ্রহণ করেছেন এবং বেশ কয়েকজন হাফেযুল হাদীস তা সহীহ হওয়ার সুস্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছেন। যেমন ইমাম নববী, তকীউদ্দীন সুব্কী, ওলিউদ্দীন ইরাকী, বদরুদ্দীন আইনী, জালালুদ্দীন সুয়ূতী প্রমুখ। দেখুন আলমাজমূ শারহুল মুহাযযাব ৩/৫২৭; নাসবুর রায়াহ ২/১৫৪; উমদাতুল কারী শারহু সহীহিল বুখারী ৭/১৭৮; ইরশাদুস সারী শারহু সহীহিল বুখারী ৪/৫৭৮; আলমাসাবীহ ফী সালাতিত তারাবীহ–আলহাভী ২/৭৪ ইত্যাদি

সায়েব ইবনে ইয়াযীদ রা.এর উপরোক্ত হাদীসটিকে আরবের গায়রে মুকাল্লেদ আলেম শায়েখ নাসিরুদ্দীন আলবানী মারহুম এবং হিন্দুস্তানের গায়রে মুকাল্লেদ আলেম মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরীর আগে কোন হাদীসের ইমাম, ফিক্হের ইমাম বা

কোন একজন মুহাদ্দিস মুহাক্কিক আলেম আমাদের জানা মতে যয়ীফ বলেননি। পূর্ববর্তীদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের বিপরীতে এই দুই ব্যক্তি কোন ধরনের দলীল-প্রমাণ ছাড়াই এই (মুতাওয়াতিরে মা'নুভী) হাদীসটিকে যয়ীফ বলে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে শায়খ আলবানী মরহুম যে সব খেয়ানত ও অসাধুতা অবলম্বন করেছেন কিংবা যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতির শিকার হয়েছেন তার অনেকগুলো সৌদি আরবের কেন্দ্রীয় দারুল ইফতার সাবেক গবেষক মুহাদ্দিস ইসমাইল ইবনে মুহাম্মদ আনসারী 'তাসহীহু সালাতিত তারাবীহ ইশ্‌রীনা রাকাআতান ওয়ার্‌রাদ্দু আলাল আলবানী ফী তাযয়ীফিহী' কিতাবে দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে চিহ্নিত করে দিয়েছেন। আর মাওলানা মুবারকপুরী যা কিছু করেছেন তার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন মুহাদ্দিসুল হিন্দ হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান আজমী রহ. তাঁর 'রাকাআতে তারাবীহ' কিতাবে। শ্রদ্ধেয় আলেমগণ এই দুটি কিতাব অধ্যয়ন করতে পারেন। আল্লাহ্ যদি তাওফীক দেন তাহলে আশা আছে বাংলাভাষী পাঠক ভাই-বোনদের সুবিধার্থে এই কিতাব দুটির বাংলা অনুবাদ আমরা তাদের হাতে তুলে দিব।

৩. তাবেয়ী ইয়াযীদ ইবনে রূমান রহ.এর বিবরণ

كَانَ النَّاسُ يَقُوْمُوْنَ فِيْ زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْ رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَّعِشْرِيْنَ رَكْعَةً.

'উমর ইবনুল খাত্তাব রা.এর যুগে মানুষ (সাহাবা ও তাবেয়ীন) রমযান মাসে ২৩ রাকাআত পড়তেন।" –মুয়াত্তা মালেক ৪০; আস্‌সুনানুল কুবরা, বায়হাকী ২/৪৯৬

৪. তাবেয়ী আব্দুল আযীয ইবনে রুফাই রহ.এর বিবরণ

كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ فِيْ رَمَضَانَ بِالْمَدِيْنَةِ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَّيُوْتِرُ بِثَلَاثٍ.

"উবাই ইবনে কা'ব রা. রমযান মাসে মদীনায় লোকদের নিয়ে বিশ রাকআত তারাবীহ এবং তিন রাকাআত বিত্‌র পড়তেন।" –মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ২/২৮৫

৫. তাবেয়ী ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী রহ.এর বিবরণ

إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ رَجُلاً يُصَلِّيْ بِهِمْ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً.

"উমর রা. এক ব্যক্তিকে আদেশ করেন, তিনি যেন লোকদের নিয়ে বিশ রাকাআত পড়েন।" –মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ২/২৮৫

এ ধরনের আরো অনেক রেওয়ায়াত আছে, যেগুলোর মূল বক্তব্য মুতাওয়াতির। ফলে এ বিষয়টি একাট্যভাবে প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবকাশ থাকে

না। এরপরও আমাদের কিছু গায়রে মুকাল্লেদ বন্ধুর অভিযোগ হল, এই বর্ণনাগুলো 'মুরসাল' আর 'মুরসাল' হল যয়ীফ, কাজেই ...।

অথচ তাবেয়ী ইমামগণের 'মুরসাল' বর্ণনা প্রামাণ্য ও গ্রহণযোগ্য হওয়া দলীলের আলোকে প্রমাণিত এবং পূর্বসূরি ইমামগণ এব্যাপারে একমত ছিলেন। এরপর যদি একই বিষয়ে একাধিক 'মুরসাল' রেওয়ায়াত থাকে কিংবা 'মুরসাল' বর্ণনার সমর্থনে উম্মাহর অবিচ্ছিন্ন সম্মিলিত কর্মধারা বিদ্যমান থাকে তাহলে তার প্রামাণ্যতার ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। যারা 'মুরসাল'কে যয়ীফ বলেছেন তারাও এক্ষেত্রে 'মুরসাল'কে সহীহ বা দলীলযোগ্য মনে করেন।

এ কথাটির পক্ষে অসংখ্য উদ্ধৃতি দেওয়া যাবে। কিন্তু আমি এখানে শুধু শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ.এর বক্তব্যটিই উদ্ধৃত করছি, যাকে আমাদের এই বন্ধুরাও অনুসরণীয় এবং 'আপন মানুষ' মনে করেন। তিনি বলেন–

اَلْمُرْسَلُ الَّذِيْ لَهُ مَا يُوَافِقُهُ أَوْ الَّذِيْ عَمِلَ بِهِ السَّلَفُ: حُجَّةٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ.

"যে 'মুরসালের' অনুকূলে অন্য কোন কিছু পাওয়া যায় কিংবা পূর্বসূরিগণ যার অনুসরণ করেছেন তা ফকীহগণের সর্বসম্মতিক্রমে দলীল হিসেবে গ্রহণীয়।" –ইকামাতুদ দলীল আলা বুতলানিত তাহ্লীল, আলফাতাওয়াল কুবরা ৪/১৭৯

আরো দেখুন, তাঁরই কিতাব মাজমূউল ফাতাওয়া ২৩/২৭১; মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যা ৪/১১৭

মোটকথা, উপরোক্ত পাঁচ রেওয়ায়াত এবং এধরনের অন্যান্য সহীহ রেওয়ায়াতের ভিত্তিতে এবং এরও উপরে সাহাবা-তাবেয়ীনের যুগ থেকে চলে আসা সম্মিলিত ও অবিচ্ছিন্ন কর্মের ভিত্তিতে আলেমগণের সর্ববাদীসম্মত বয়ান হল হযরত উমর রা.এর যুগে মসজিদে নববীতে বিশ রাকাআত তারাবীহ হত।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এ প্রসঙ্গেই বলেছেন–

إِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ كَانَ يَقُوْمُ بِالنَّاسِ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً فِيْ قِيَامِ رَمَضَانَ وَيُوْتِرُ بِثَلَاثٍ.

"এ বিষয়টি প্রমাণিত যে, উবাই ইবনে কা'ব রা. রমযানের তারাবীতে মুসল্লীদেরকে নিয়ে বিশ রাকাআত পড়তেন এবং তিন রাকাআত বিতর পড়তেন।" –মাজমূউল ফাতাওয়া ২৩/১১২-১১৩

বিশ রাকাআত তারাবীর ব্যাপারে তিনি আরো বলেছেন–

ثَبَتَ مِنْ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَعَمَلِ الْمُسْلِمِيْنَ.

"খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত এবং মুসলিম জাতির সম্মিলিত কর্ম দ্বারা এটি প্রমাণিত।" –মাজমূউল ফাতাওয়া ২৩/১১৩

খলীফায়ে রাশেদ উসমান যিন-নূরাইন রা.এর যুগ

হিজরী ১৪ সাল থেকে ফারূকে আযম রা.এর শাহাদত পর্যন্ত সর্বমোট ১০ বছর হযরত উসমান যিননূরাইন রা.এর উপস্থিতিতেই বিশ রাকাআত তারাবীহ হয়েছে। তিনি এর উপর কোন আপত্তি করেননি। এছাড়া আস্‌সুনানুল কুবরা, বায়হাকীর উদ্ধৃতিতে উল্লিখিত প্রথম হাদীসটিতে এ বিষয়ে ইঙ্গিত আছে যে, উসমান রা.এর যুগে বিশ রাকাআত তারাবীহ পড়া হত। উপরন্তু তিনি যদি নতুন কোন ফরমান জারি করতেন তাহলে অবশ্যই ইতিহাসের পাতায় তা সংরক্ষিত থাকত।

খলীফায়ে রাশেদ আলী ইবনে আবি তালেব রা.এর যুগ

৬. বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম আবু আব্দুর রহমান আসসুলামী রহ.এর বিবরণ

عَنْ عَلِيٍّ، دَعَا الْقُرَّاءَ فِيْ رَمَضَانَ فَأَمَرَ مِنْهُمْ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً، وَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُوْتِرُ بِهِمْ.

“আলী রা. রমযানে কারীগণকে ডাকেন এবং তাঁদের একজনকে আদেশ করেন, তিনি যেন লোকদের নিয়ে বিশ রাকাআত পড়েন এবং আলী রা. তাদেরকে নিয়ে বিতর পড়তেন।” –আস্‌সুনানুল কুবরা, বায়হাকী ২/৪৯৬-৪৯৭

৭. তাবেয়ী আবুল হাসনা রহ.এর বিবরণ

إِنَّ عَلِيًّا أَمَرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِهِمْ فِيْ رَمَضَانَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً.

“আলী রা. এক ব্যক্তিকে আদেশ করেন, তিনি যেন লোকদের নিয়ে বিশ রাকাআত তারাবীহ পড়েন।” –মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ২/২৮৫

উপরোক্ত রেওয়ায়াত দুটির সনদ গ্রহণযোগ্য। পারিভাষিক শব্দে প্রথমটির সনদ حَسَنٌ لِذَاتِهِ এবং দ্বিতীয়টির সনদ حَسَنٌ لِغَيْرِهِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمَسْتُوْرَ مِنْ طَبَقَةِ التَّابِعِيْنَ حُجَّةٌ.

দেখুন আলজাওহারুন নাকী, ইবনুত তুরকুমানী ২/৪৯৫-৪৯৭; রাকাআতে তারাবীহ, মুহাদ্দিস হাবীবুর রহমান আজমী ৭৭-৯০

মনে রাখবেন, ৬ নম্বরে উল্লিখিত রেওয়ায়াতটি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যাহ ২/২২৪-এ এবং ইমাম শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. ‘আলমুন্‌তাকা ৫৪২-এ দলীল হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং এর মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, আলী রা. তারাবীর জামাআত, রাকাআত-সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে দ্বিতীয় খলীফা হযরত ফারূকে আজম রা.এর রীতির উপরই ছিলেন।

হযরত আলী রা. যে বিশ রাকাআত তারাবীহ শিক্ষা দিয়েছেন তা এ থেকেও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাঁর বিশেষ বিশেষ ছাত্রদের আমলও এরূপ ছিল। যেমন, শুতাইর ইবনে শাকাল, আব্দুর রহমান ইবনে আবী বাক্‌রা, সায়ীদ ইবনে আবিল হাসান, সুআইদ ইবনে গাফালা এবং আলী ইবনে রাবীআহ। এঁরা সবাই স্ব স্ব স্থানে অনেক বড় ইমাম ছিলেন এবং এঁরা সবাই তাবেয়ীনের অন্তর্ভুক্ত। তাঁদের সবার ব্যাপারেই হাদীসের কিতাবসমূহে বিশ রাকাআত পড়ার অনেক রেওয়ায়াত সহীহ সনদে বিদ্যমান আছে।

দেখুন, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ২/২৮৫; আস্‌সুনানুল কুবরা, বায়হাকী ২/৪৯৬; কিয়ামুল লাইল, মুহাম্মদ ইবনে নাস্‌র আলমারওয়াযী ২০০-২০২

এ পর্যন্ত যা কিছু উল্লেখ করা হয়েছে তার সারকথা হল, বিশ রাকাআত তারাবীহ খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত। হযরত উমর, হযরত আলী রা.এর যুগে তাদের আদেশক্রমে বিশ রাকাআত তারাবীহ হত। হযরত উসমান রা. উমর ফারূক রা.এর যুগে এবং নিজ খেলাফতকালে এমনটিই করেছেন। এটাই সুনির্ধারিত। আর হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. থেকে বিশ রাকআতের বিরুদ্ধে একটি অক্ষরও কোথাও নেই। কোন একটি বিষয় খুলাফায়ে রাশেদীনের কোন একজনের সুন্নত হিসেবে প্রমাণিত হয়ে গেলেও তা মুসলিম উম্মাহর জন্য অবশ্য অনুসরণীয় হয়। এখন যদি কোন বিষয় তিনজন খলীফা থেকে প্রমাণিত হয় তাহলে তার ব্যাপারে উম্মাহর করণীয় কী হবে তা সহজেই বোধগম্য! এ পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই ওসিয়তটি পুনরায় স্মরণ করুন, "তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে বেঁচে থাকবে তারা অনেক মতভেদ দেখতে পাবে। তোমরা আমার পরে আমার সুন্নত এবং আমার হেদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতকে আকড়ে রেখো। একে অবলম্বন কর এবং মাড়ির দাঁত দ্বারা কামড়ে রেখো। তোমরা (ধর্মীয় বিষয়ে) সব ধরনের নবআবিষ্কৃত বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা, সকল নতুন জিনিস বেদআত। আর সকল বেদআত গোমরাহী।"

দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলীল ঃ মুহাজির ও আনসারীগণের ইজমা এবং অন্য সকল সাহাবীর ইজমা

কুরআন কারীম সাহাবায়ে কেরামকে হেদায়াতপ্রাপ্ত এবং অনুসরণযোগ্য সাব্যস্ত করেছে। বিশেষ করে মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণের অনুসরণের আদেশ দিয়েছে। ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহ. 'ইলামুল মুয়াক্কিয়ীন' কিতাবে কুরআন কারীমের আয়াত ও হাদীস শরীফের আলোকে এ বিষয়ে উঁচু পর্যায়ের আলোচনা করেছেন। আলোচনাটি দেখার মত ও পড়ার মত। –ইলামুল মুয়াক্কিয়ীন ৪/৯৪-১১৯; শিয়া-সুন্নী ইখতিলাফাত আওর সিরাতে মুসতাকীম, মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানভী ৩২৬-৩৫১

যাহোক কোন বিষয়ে মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হলে তা কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের জন্য অনুসরণীয়। তারাবীহ বিশ রাকাআত মাসনূন হওয়ার ব্যাপারে শুধু মুহাজির ও আনসার নয়, সকল সাহাবীর ঐকমত্য রয়েছে।

মসজিদে নববীতে ১৪ হিজরী থেকেই হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা.এর ইমামতিতে প্রকাশ্যে বিশ রাকাআত তারাবীহ পড়া হত। প্রশ্ন হল, সেই সময় মুসল্লী ও মুক্তাদী হতেন কারা? এই মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণই সেই মুবারক জামাআতের মুসল্লী ও মুক্তাদী ছিলেন। শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কেরাম– যাদের থেকে অন্যান্য সাহাবী দ্বীন শিখতেন, যাঁরা কুরআনের শিক্ষা, হাদীস-বর্ণনা ও ফিক্হ-ফত্ওয়ার স্তম্ভ ছিলেন তাঁদের– অধিকাংশই তখন মদীনায় ছিলেন। দু একজন যাঁরা মদীনার বাইরে ছিলেন তাঁরাও মক্কা-মদীনার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতেন এবং খলীফায়ে রাশেদের কর্ম ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ওয়াকিফ-হাল থাকতেন; তাঁদের একজনও কি বিশ রাকাআত তারাবীর বিপক্ষে কখনো কোন আপত্তি করেছেন? আপত্তি তো দূরের কথা, তাঁদের কর্মও তো খুলাফায়ে রাশেদীন থেকে অভিন্ন ছিল। তাঁদের জীবদ্দশায়ও এবং তাঁদের ইন্তেকালের পরেও। বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম আতা ইবনে আবী রাবাহ মক্কী রহ. (২৭-১১৪হি.) বলেন–

أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ ثَلاَثًا وَّعِشْرِيْنَ رَكْعَةً بِالْوِتْرِ.

"আমি লোকদেরকে (সাহাবা-প্রথম সারির তাবেয়ীনকে) দেখেছি, তাঁরা বিতরসহ তেইশ রাকাআত পড়তেন।" –মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ২/২৮৫

আর আতা ইবনে আবী রাবাহ রহ তো নিজেই বলেছেন, আমি দুইশ সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছি। –তাহযীবুল কামাল ১৩/৪৯

অন্যান্য তাবেয়ী থেকেও এরূপ বিবরণ আছে। এই বাস্তবতাকেই ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহ. 'আলইস্তিযকার' কিতাবে নিম্নোক্ত শব্দে উল্লেখ করেছেন–

وَهُوَ الصَّحِيْحُ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ مِنْ غَيْرِ خِلاَفٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ.

"এটিই উবাই ইবনে কা'ব রা. থেকে বিশুদ্ধরূপে প্রমাণিত এবং এতে সাহাবীগণের কোন ভিন্নমত নেই।" –আলইস্তিয্কার ৫/১৫৭

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ.এর ভাষায়–

إِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ كَانَ يَقُوْمُ بِالنَّاسِ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً فِيْ قِيَامِ رَمَضَانَ وَيُوْتِرُ بِثَلاَثٍ فَرَأَى كَثِيْرٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ ذٰلِكَ هُوَ السُّنَّةُ. لِأَنَّهُ أَقَامَهُ بَيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ مُنْكِرٌ.

"এটা প্রমাণিত যে, উবাই ইবনে কা'ব রা. রমযানের তারাবীতে লোকদের নিয়ে

বিশ রাকাআত পড়তেন এবং তিন রাকাআত বিতর পড়তেন। তাই অনেক আলেম এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এটিই সুন্নত। কেননা, উবাই ইবনে কা'ব রা. মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণের উপস্থিতিতেই বিশ রাকাআত পড়িয়েছেন এবং কোন একজনও তাতে আপত্তি করেননি।" –মাজমূউল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়া ২৩/১১২-১১৩

ইমাম আবু বকর কাসানী রহ. তারাবীর নামায বিশ রাকাআত না তারচেয়ে বেশি– যেমনটি 'হাররা'এর হৃদয়বিদারক ঘটনার আগ থেকে মদীনাবাসীর আমল ছিল– এর আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন–

وَالصَّحِيْحُ قَوْلُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ جَمَعَ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلٰى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَصَلّٰى بِهِمْ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ. فَيَكُوْنُ إِجْمَاعًا مِّنْهُمْ عَلٰى ذٰلِكَ.

"অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম যা বলেছেন, তা-ই ঠিক। কেননা হযরত উমর রা. রমযান মাসে সাহাবায়ে কেরামকে উবাই ইবনে কা'ব রা.এর ইমামতিতে একত্র করেন এবং উবাই ইবনে কা'ব তাদেরকে নিয়ে প্রতিরাতে বিশ রাকাআতই পড়তেন এবং তাদের একজনও এ ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করেননি। সুতরাং এব্যাপারে তাদের সকলের ইজমা সম্পন্ন হয়েছে।" –বাদায়েউস সানায়ে ১/৬৪৪

ইমাম ইবনে কুদামা মাকদেসী রহ. বলেন–

مَا فَعَلَهٗ عُمَرُ وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ فِيْ عَصْرِهٖ أَوْلٰى بِالْاِتِّبَاعِ.

"উমর রা. যা করেছেন এবং তাঁর খেলাফতকালে অন্যান্য সাহাবীগণ যে ব্যাপারে একমত হয়েছে, তা-ই অনুসরণের অধিক উপযুক্ত।" –আলমুগনী ২/৬০৪

মোটকথা, সাহাবায়ে কেরামের পুণ্যযুগে তারাবীর ব্যাপারে 'সাবীলুল মুমিনীন'– মুমিনদের সকলের অনুসৃত পথ এই ছিল যে, তাঁরা বিশ রাকাআত তারাবীহ পড়তেন এবং কেউ তার উপর আপত্তি করতেন না। কেউ এটাকে না জায়েযও বলতেন না কিংবা বেদআত বা হাদীস ও সুন্নাহর খেলাফও আখ্যা দিতেন না। এজন্য যারা বিশ রাকাআত তারাবীর উপর আপত্তি করে এবং তাকে সুন্নাহ বা হাদীসের খেলাফ বলে তারা সাবীলুল মুমিনীন থেকে বিচ্যুতিই গ্রহণ করে নিয়েছে।

কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতটি তাদের স্মরণে রাখা উচিত–

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰي وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا.

"যে কেউ রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সকল মুমিনের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ওই দিকেই ফেরাব যেদিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান।" –সূরা নিসা ১১৫

চতুর্থ দলীল ঃ মারফূ হুক্‌মী

মারফূ হুক্‌মী হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই হাদীস বা শিক্ষা যা বর্ণনার সাধারণ রীতি অনুসারে হাদীস হিসেবে বর্ণিত হয়নি, কিন্তু বাস্তবে তা নবীজীর হাদীস। উসূলে হাদীস ও উসূলে ফিক্‌হের সর্বজনস্বীকৃত মূলনীতি অনুযায়ী মারফূ হুক্‌মী মারফূ হাদীসের (নবীজীর শিক্ষা ও নির্দেশনার)ই একটি প্রকার।

আমরা ইতিপূর্বে খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত, মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণের ঐকমত্য এবং সাহাবায়ে কেরামের ইজ্‌মা উল্লেখ করেছি। এ সবগুলো স্বতন্ত্র দলীল; কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই দেখা যাবে এগুলো পরোক্ষভাবে মারফূ হাদীস (তথা নবীজীর শিক্ষা।) কেননা নামাযের রাকাআত-সংখ্যা কী হবে তা শুধু কিয়াস ও যুক্তি দ্বারা নির্ধারণ করা যায় না। এজন্য শরীয়ত প্রতি নামাযের রাকাআত সংখ্যা নির্ধারণ করে দিয়েছে। একথা ঠিক যে, নফল নামাযের রাকাআত সংখ্যা নির্ধারিত নয়। হাদীস শরীফের বক্তব্য অনুযায়ী মানুষ দুই রাকাআত করে যত রাকাআত ইচ্ছা পড়তে পারে; কিন্তু তারাবীর নামায যেহেতু সুন্নতে মুয়াক্কাদা, তাই এর ব্যাপারে নফল নামাযের নিয়ম প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। কিন্তু তারপরও যদি সাধারণ নফল নামাযের নীতি এই সুন্নতে মুয়াক্কাদা নামাযের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয় তাহলে সর্বোচ্চ এতটুকু বলা যায় যে, যার যত রাকাআত ইচ্ছা সে তত রাকাআত পড়বে।

তারাবীর নামায বিশ রাকাআত হবে তাতো এই নীতির আলোকে বলা যায় না। সুনির্দিষ্টভাবে রাকাআত সংখ্যা নির্ধারণের জন্য শরীয়তের পক্ষ থেকে তা নির্ধারণ করে দেওয়া অপরিহার্য। শুধু কিয়াস বা যুক্তির মাধ্যমে এটি সম্ভব নয়। সুতরাং বলতেই হবে সাহাবায়ে কেরাম এটি নবীজী থেকেই গ্রহণ করেছেন। উসূলে হাদীস ও উসূলে ফিক্‌হের নীতি হল কোন একজন সাহাবীর এমন কোন শিক্ষা বা নির্দেশনা যা কিয়াস বা ইজ্‌তিহাদের ভিত্তিতে হতে পারে না– যেহেতু সাহাবায়ে কেরাম দ্বীনের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত শুধু আন্দাজের ভিত্তিতে দিতে পারেন না– তাই তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেই গ্রহণকৃত গণ্য করা হয় এবং মারফূ হুক্‌মী হিসেবে সাব্যস্ত হয়।

আমাদের আলোচ্য মাসআলাটি তো এক দুজন সাহাবীর নয়, সকল সাহাবীর সম্মিলিত কর্ম ও সিদ্ধান্তের ব্যাপার এবং তাদের মধ্যে বিশেষভাবে আশারায়ে মুবাশ্‌শারা

ও মুহাজির-আনসারী সাহাবীগণের শিক্ষা ও নির্দেশনার ব্যাপার। তো এধরনের বিষয়ে যা ইজতিহাদের ভিত্তিতে সম্পন্ন করা সম্ভব নয় সাহাবায়ে কেরামের এই শিক্ষা মারফূ হুক্‌মী দ্বাড়া আর কী হতে পারে!

ইমাম আবু হানীফা রহ. এই বাস্তবতা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় তাঁর শাগরিদ 'কাযিল কুযাত' ইমাম আবু ইউসুফ রহ.কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন। ফিক্‌হে হানাফীর নির্ভরযোগ্য কিতাব 'আলইখতিয়ার লি-তালীলিল মুখতার'এর বরাতে পূর্ণ কথাটি উল্লেখ করছি–

روى أسد بن عمرو، عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة رحمه الله، عن التراويح وما فعله عمر رضي الله عنه، فقال: التراويح سنة مؤكدة ولم يتخرصه عمر من تلقاء نفسه، ولم يكن فيه مبتدعا ولم يأمر به إلا عن أصل لديه وعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد سن عمر هذا وجمع الناس على أبي بن كعب فصلاها جماعة والصحابة متوافرون، منهم عثمان، وعلي، وابن مسعود، وابنه، وطلحة، والزبير، ومعاذ، وأبي وغيرهم من المهاجرين والأنصار، رضي الله عنهم أجمعين، وما رد عليه واحد منهم، بل ساعدوه ووافقوه وأمروا بذلك.

"আসাদ ইবনে আমর ইমাম আবু ইউসুফ রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি আবু হানীফা রহ.কে তারাবীহ এবং এব্যাপারে উমর রা.এর কর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করি। তিনি এর উত্তরে বলেছেন, তারাবীহ সুন্নতে মুয়াক্কাদা এবং উমর রা. তা নিজের পক্ষ থেকে অনুমান করে নির্ধারণ করেননি। তিনি এ ব্যাপারে নতুন কিছুর আবিষ্কারও করেননি। তিনি দলীলের ভিত্তিতে এবং নবীজী থেকে প্রাপ্ত কোন নির্দেশনার ভিত্তিতে এই আদেশ করেছেন। তাছাড়া উমর রা. এই নিয়ম চালু করেন এবং উবাই ইবনে কা'ব রা.এর ইমামতিতে সকল মানুষকে একত্র করে দেন। ফলে তাঁরা সবাই এই নামাযটি জামাআতের সাথে আদায় করতে থাকেন। তখন সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। যাদের মধ্যে উসমান, আলী, ইবনে মাসউদ, ইবনে উমর, তলহা, যুবায়ের, মুআজ ও উবাই রা. প্রমুখ বড় বড় মুহাজির ও আনসারী সাহাবী ছিলেন। তাঁদের কেউই এ বিষয়টিকে প্রত্যাখ্যান করেননি; বরং সবাই তাঁর সমর্থন করেছেন এবং তাঁর সাথে একমত পোষণ করেছেন এবং অন্যদেরকে এই আদেশই করেছেন।" –আলইখতিয়ার লি-তালীলিল মুখতার, ইমাম আবুল ফযল মাজদুদ্দীন আলমাওসিলী ১/৭৪

পঞ্চম দলীল ঃ সুন্নতে মুতাওয়ারাসা

ইমাম আবু হানীফা রহ.এর উপরোক্ত বক্তৃতা যা নিঃসন্দেহে বাস্তবতার বিবরণ এবং প্রত্যেক সুস্থ-বুদ্ধির অধিকারী, শরীয়তের যথার্থ জ্ঞানীরই আত্মার ধ্বনি তা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বিশ রাকাআতের বিষয়টি নবী-শিক্ষার উপরই ভিত্তিশীল; যে শিক্ষার উপর সাহাবা যুগ থেকেই মুসলিম উম্মাহর ব্যাপক ও সম্মিলিত কর্মধারা জারি হয়েছে। নবী-শিক্ষার এই প্রকারটিকে 'সুন্নতে মুতাওয়ারাসা' (ব্যাপক ও সম্মিলিত কর্মের মাধ্যমে অনুসৃত সুন্নত) বলা হয়; যার শক্তি ও মাকাম শুধু মৌখিক বর্ণনাসূত্রে প্রাপ্ত বিবরণ থেকে অনেক বেশি। এই নীতিটির ব্যাপারে আরো জানার জন্য শ্রদ্ধেয় আলেমগণ নিম্নোক্ত কিতাবসমূহ অধ্যায়ণ করতে পারেন–

(١) اَلْجَامِعُ لِابْنِ أَبِي زَيْدٍ الْقَيْرَوَانِي ص ١١٧ (٢) تَرْتِيْبُ الْمَدَارِكِ، قاضي عياض ١: ٦٦ (٣) الْكِفَايَةُ فِي عِلْمِ الرِّوَايَةِ، خطيب بغدادي ص ٣٢-٣٣، ٤٧٢ (٤) أَثَرُ الْحَدِيْثِ الشَّرِيْفِ فِي اخْتِلَافِ الْأَئِمَّةِ الْفُقَهَاءِ، شيخ محمد عوامة ص ٨٢-٩٥

আর এই সুন্নতে মুতাওয়ারাসা হল তারাবীর রাকাআত বিষয়ক মাসআলাটির মূল বুনিয়াদ। আমাদের আগের আলোচনা থেকেও বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। আরো স্পষ্টভাবে বোঝার জন্য নিম্নোক্ত রেওয়ায়াতটি লক্ষ করুন।

তাবেয়ী আবুল আলিয়া হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা.এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেন–

إِنَّ عُمَرَ أَمَرَ أُبَيًّا أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِيْ رَمَضَانَ، فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ يَصُوْمُوْنَ النَّهَارَ وَلَا يُحْسِنُوْنَ أَنْ يَقْرَؤُوْا، فَلَوْ قَرَأْتَ الْقُرْآنَ عَلَيْهِمْ بِاللَّيْلِ، فَقَالَ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ هٰذَا شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ، وَلٰكِنَّهُ حَسَنٌ، فَصَلّٰى بِهِمْ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً.

"হযরত উমর রা. উবাই ইবনে কা'ব রা.কে রমযান মাসে লোকদের নিয়ে নামায পড়ার আদেশ করতে গিয়ে বলেন, লোকেরা দিনে রোযা রাখে কিন্তু রাতের বেলা উত্তমরূপে কুরআন পড়তে পারে না। আপনি যদি রাতে তাদের সামনে কুরআন পড়তেন। হযরত উবাই রা. উত্তরে বললেন, আমীরুল মুমিনীম, এ বিষয়টি তো আগে ছিল না। উত্তরে তিনি বললেন, তা আমি জানি; কিন্তু এটা ভাল। এরপর হযরত উবাই তাদেরকে নিয়ে বিশ রাকাআত নামায পড়েন।" –আলআহাদীসুল মুখতারাহ, ইমাম জিয়াউদ্দীন মাকদেসী ১/৩৮৪; তাসদীদুল ইসাবা ৮০; মুসনাদে আহমাদ ইবনে মানী–কানযুল উম্মাল ৮/৪০৮, হাদীস ২৩৪৭১

মুসনাদে আহমদ ইবনে মানী-এর সনদ এই মুহূর্তে আমাদের সামনে নেই; কিন্তু আলআহাদীসুল মুখতারাহ'র– যা সহীহ হাদীসের একটি খুব ভাল সংকলন– সনদ খোদ

শায়খ আলবানী মরহুম তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন এবং একে যয়ীফ সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বাস্তব কথা হল সনদটি 'হাসান' পর্যায়ের এবং সেই সনদে বর্ণিত হাদীসটির বক্তব্য আরো অন্যান্য দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে সহীহ।

এই হাদীসে লক্ষ করার ব্যাপার হল কয়েকটি ছোট ছোট জামাআতকে একত্র করে এক ইমামের পেছনে একটি বড় জামাআত বানিয়ে দেওয়া একটি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ব্যাপার। শরীয়তের পক্ষ থেকে এর নিষিদ্ধতার কোন দলীল নেই; বরং তা শরীয়তের রুচির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ। তথাপি উবাই ইবনে কা'ব রা. এ ব্যাপারে নিজের খট্‌কার কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলে দিয়েছেন– هٰذَا شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ 'এভাবে এক জামাআতে তারাবীহ পড়ার ব্যবস্থা তো আগে ছিল না।' এরপর হযরত উমর রা. তাঁকে বিষয়টি বুঝিয়ে দিলে তিনি সম্মত হন। কিন্তু তারাবীর রাকাআত সংখ্যার ব্যাপারে তাকে কোন কথা বলতে হয়নি। তিনি বিনা দ্বিধায় বিশ রাকাআত তারাবীহ পড়িয়েছেন। এটা কীভাবে সম্ভব হল? যদি বিশ রাকাআত তারাবীর ব্যাপারে তাঁর কাছে নবী-আদর্শ বিদ্যমান না থাকতো তাহলে তো তিনি আরো শক্তভাবে বলতেন– إِنَّ هٰذَا شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ 'এই বিষয়টি তো আগে ছিল না।' তারাবীর রাকাআত-সংখ্যা তো কোন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ব্যাপার নয়, শরীয়তের ব্যাপার এবং শরীয়তের একটি বিধান। যদি প্রথম থেকে অন্য কোন রীতি থাকত যেমন প্রথমে আট রাকাআত ছিল আর এখন নতুন করে বিশ রাকাআত শুরু হচ্ছে তাহলে যে ব্যক্তি একটি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ব্যাপারে বলেন, এ বিষয়টি আগে ছিল না, শরীয়তের বিধান-বিষয়ক ব্যাপারে তার অবস্থান কী হবে? কিন্তু না উবাই ইবনে কা'ব রা. এ ব্যাপারে কোন আপত্তি করেছেন, না আশারায়ে মুবাশশারার কেউ, না কোন মুহাজির বা আনসারী সাহাবী আর না অন্য কোন সাহাবী। যদি তাদের নিকটে বিশ রাকআত তারাবীর ব্যাপারে কোন নববী-শিক্ষা না থাকত বরং এর বিপরীতে আট রাকাআতের শিক্ষাই থাকত তাহলে তাঁরা সবাই কীভাবে নিশ্চুপ থাকেন? কীভাবে নিজেরা বিশ রাকাআত পড়তে থাকেন? আর কীভাবেই বা মসজিদে নববীতে বিশ রাকাআত হওয়ার উপর সন্তুষ্ট থাকেন?

একেতো এ বিষয়টি কিয়াস বা ইজতিহাদের ভিত্তিতে সমাধা করার মত নয়; তাছাড়া কোন রেওয়ায়াতেই এ বিষয়টি প্রমাণিত নয় যে হযরত উমর রা. তারাবীর রাকাআত সংখ্যার ব্যাপারে মুহাজির বা আনসারীদের সাথে কোন পরামর্শ করেছেন; অথচ শরীয়তের বিষয়াদি এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ব্যাপারাদিতে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করাই তাঁর সাধারণ অভ্যাস ছিল। তো কোন ধরনের পরামর্শ ইত্যাদি ছাড়া কীভাবে সবাই বিশ রাকাআতের ব্যাপারে একমত হয়ে গেলেন? কোন সন্দেহ নেই যে, তাদের এই ঐকমত্যের পেছনে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ

বিষয়ক শিক্ষা ও নির্দেশনাই কার্যকর ছিল। যদি তারাবীর ব্যাপারে তাদের কাছে নববী-শিক্ষা এটাই হত যে, তারাবীহ কেবল আট রাকাআতই হতে হবে, তাহলে না হযরত উবাই বিশ রাকাআত পড়াতেন, না মুহাজির-আনসার ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম এসম্পর্কে নিশ্চুপ থাকতেন।

দ্বীনের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের সংবেদনশীলতার সামান্য জ্ঞান যারা রাখেন তারা এ বিষয়টি খুব ভালভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন। এই অবনতির যুগেও কোন বেদআতের সূচনা ঘটলে উলামায়ে কেরাম তার প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেন; তো একটু চিন্তা করুন, সেই পুণ্যযুগের ব্যাপারে আপনার ধারণা কী হওয়া উচিত?

সেই সোনালী সমাজের ব্যাপারে এই কল্পনাও কী করা সম্ভব যে, সেখানে নববী-শিক্ষা ও নির্দেশনার পরিপন্থী একটি নতুন পথের উদ্ভব ঘটবে আর তাঁরা সেটাকে শরীয়ত হিসেবে গ্রহণ করে নিবেন? নাউযুবিল্লাহ মিনযালিক।

সারকথা হল, বিশ রাকাআত তারাবীর ব্যাপারে মুহাজির ও আনসারের ঐকমত্য, সাহাবায়ে কেরামের ইজ্‌মা এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতের মূলে রয়েছে তারাবীহ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন ফরমান বা আমল– যা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ব্যাপক ও অবিচ্ছিন্নভাবে আজ পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে। একেই সুন্নতে মুতাওয়ারাসা বলে– যা হাদীস ও সুন্নাহর একটি উন্নত প্রকার এবং যার অনুসরণ করার আদেশ মুমিনদেরকে করা হয়েছে।

ষষ্ঠ দলীল ঃ মারফূ হাদীস

এখন প্রশ্ন হল সেই নববী ফরমান বা নববী আমলের বিবরণ কোথায়? এর উত্তর আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, যে নববী-শিক্ষা সাহাবা যুগ থেকে ব্যাপক ও অবিচ্ছিন্ন কর্ম-ধারার মাধ্যমে, মারফূ হুক্‌মীর মাধ্যমে, ইজমায়ে সাহাবার বা খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতের ভিত্তিরূপে পরবর্তী লোকদের কাছে পৌঁছেছে, তার ব্যাপারে মৌখিক বিবরণ-ভিত্তিক বর্ণনাধারার আর প্রয়োজন থাকে না। এসব ক্ষেত্রে কখনো মৌখিক বিবরণ সহীহ সনদে বিদ্যমান থাকে, আবার কখনো যয়ীফ সনদে থাকে। কখনো একেবারেই থাকে না। –ফাতহুল বারী শরহু সহীহিল বুখারী, ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী ৬/১২৪

কিন্তু যেহেতু মৌখিক বর্ণনাধারার চেয়ে উপরোক্ত পন্থাগুলো প্রামাণ্যতার ক্ষেত্রে অধিক শক্তিশালী, তাই শুধু এ কারণে যে, মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণিত নয়, উপরোক্ত দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত কোন বিষয়কে অস্বীকার করার কোন সুযোগ শরীয়তে নেই। সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির আলোকেও এ বিষয়টি হাস্যকর যে, একদিকে দুএকজন বর্ণনাকারী থেকে প্রাপ্ত বিবরণকে শুধু এজন্য যে তা মৌখিক বর্ণনাসূত্রে বর্ণিত

হয়েছে, গ্রহণ করা হবে, অপরদিকে নবীজীর যে শিক্ষাটি সুন্নতে মুতাওয়ারাসা এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতের মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে তা অস্বীকার করা হবে। অথচ দ্বিতীয় বিষয়টি হাদীসে মুতাওয়াতিরের (বিপুলসংখ্যক বর্ণনাকারীর বিবরণের) মাধ্যমে প্রাপ্ত শিক্ষার সমপর্যায়ভুক্ত। তথাপি বিশ রাকাআত তারাবীর ব্যাপারে উপরোক্ত শক্তিশালী দলীল-প্রমাণ ছাড়াও নববী-আমলের একটি মৌখিক বিবরণও হাদীসের কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে।

ইমাম আবু বকর ইবনে আবী শাইবা রহ. (১৫৯-২৩৫ হি.) তাঁর মূল্যবান হাদীস সংকলন আলমুসান্নাফ-এ বলেন–

حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ فِي رَمَضَانَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَالْوِتْرَ.

"আমাকে ইয়াযীদ ইবনে হারুন হাদীস বয়ান করেছেন। তিনি বলেন, আমাকে ইবরাহীম ইবনে উসমান বলেছেন, তিনি হাকাম থেকে, তিনি মিকসাম থেকে এবং তিনি ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে বিশ রাকাআত তারাবীহ ও বিতর পড়তেন।" –আলমুসান্নাফ ২/২৮৮

এই হাদীসটি আমাদের হাতের নাগালের অন্যান্য নির্ভরযোগ্য কিতাবেও রয়েছে। যেমন, আলমুনতাখাব মিন মুসনাদি আব্দ ইবনে হুমাইদ ২১৮, হাদীস ৬৫৩; আস্সুনালুল কুবরা, বায়হাকী ২/৪৯৬; আলমুজামুল কাবীর, তবারানী ১১/৩১১, হাদীস ১২১০২; আলমুজামুল আওসাত, তবারানী ১/৪৪৪, হাদীস ৮০২; আত্তাম্হীদ, ইবনে আব্দুল বার ৮/১১৫; আলইস্তিয্কার ৫/১৫৬

এই হাদীসটির ব্যাপারে গায়রে মুকাল্লেদদের দাবি হল, এটি মওযূ। কিন্তু যখন তাদেরকে চ্যালেঞ্জ দেওয়া হল যে, কোন হাদীসের ইমাম বা অন্তত নির্ভরযোগ্য কোন মুহাদ্দিসের উদ্ধৃতিতে এর মওযূ হওয়া প্রমাণ কর, শুধু মৌখিক দাবিতে কাজ হবে না, তখন তারা এর কোন উদ্ধৃতি দিতে সক্ষম হয়নি।

হাঁ, এটা ঠিক যে, একদল মুহাদ্দিস এর সনদকে যয়ীফ বলেছেন। কেননা এর সনদে ইবরাহীম ইবনে উসমান নামক একজন রাবী রয়েছে যিনি যয়ীফ। (মনে রাখতে হবে যে, অগ্রগণ্য মতানুসারে ইবরাহীম ইবনে উসমানকে চরম যয়ীফ বা মাতরূক-পরিত্যাজ্য বলা ঠিক নয়। দেখুন আলকামিল, ইবনে আদী ১/৩৮৯-৩৯২; তাহযীবুত তাহযীব ১/১৪৪; ইলাউস সুনান ৭/৮২-৮৪; রাকাআতে তারাবী, মুহাদ্দিস হাবীবুর রহমান আজমী ৬৩-৬৯; রিসালায়ে তারাবীহ, মাওলানা গোলাম রাসূল (আহ্লে হাদীস আলেম) ২৪-২৫

মওযূ ও যয়ীফের মধ্যে আসমান-যমিন পার্থক্য। মওযূ তো হাদীসই নয়, মিথ্যুকরা একে হাদীসের নামে চালিয়ে দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে মাত্র। আর যয়ীফ অর্থ হল বিবরণটির সনদে কিছুটা দুর্বলতা আছে। বলাবাহুল্য, সনদের কিছুটা দুর্বলতার কারণে বিবরণটিকে ভিত্তিহীন বলে দেওয়া যায় না। উসূলে হাদীসের নির্ভরযোগ্য মূলনীতি হল, যয়ীফ দুই প্রকার–এক. যে 'যয়ীফ' সনদে বর্ণিত রেওয়ায়াতটির বক্তব্যও শরীয়তের দৃষ্টিতে আপত্তিজনক। অর্থাৎ এই বক্তব্যের অনুকূলে শরয়ী কোন দলীলের সমর্থন তো নেই-ই বরং তার বিপরীতে দলীল বিদ্যমান রয়েছে। এ ধরনের যয়ীফ কোন অবস্থাতেই আমলযোগ্য নয়। দুই. যে রেওয়ায়াতটি 'যয়ীফ' সনদে বর্ণিত; কিন্তু তার বক্তব্যের সমর্থনে শরীয়তের অন্য দলীল-প্রমাণ রয়েছে। মুহাক্কিক মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের সিদ্ধান্ত হল এধরনের রেওয়ায়াতকে 'যয়ীফ' বলা হলে তা হবে শুধু 'সনদ'এর বিবেচনায় এবং ফর্মালিটিমূলক। অন্যথায় বক্তব্য ও মর্মের বিচারে এটি সহীহ।

বিশ রাকাআত তারাবীর ব্যাপারে যে রেওয়ায়াতটি সবশেষে উল্লেখ করা হয়েছে তার ব্যাপারটিও এমন। অর্থাৎ শুধু সনদের বিবেচনায় দুর্বল; কিন্তু এর বক্তব্যের সমর্থনে ইতিপূর্বে উল্লিখিত পাঁচ ধরনের দলীলের শক্তিশালী সমর্থন বিদ্যমান রয়েছে। শাস্ত্রীয় পরিভাষায় এধরনের যয়ীফকে اَلضَّعِيْفُ الْمُتَلَقّٰى بِالْقَبُوْلِ 'এমন হাদীস যার সনদ যয়ীফ, কিন্তু মান ও এর বক্তব্য সাহাবা যুগ থেকে নিয়ে গোটা উম্মতের আমলের মাধ্যমে অনুসৃত।' যয়ীফ হাদীসের এই প্রকারটির ব্যাপারে উসূলে হাদীসের সিদ্ধান্ত হল, তা সহীহ এবং দুএক সূত্রে বর্ণিত সাধারণ সহীহ হাদীসের চেয়ে এর মাকাম ও মর্যাদা অনেক উপরে।

উসূলে হাদীসের এই নীতির ব্যাপারে হাদীসশাস্ত্রের অনেক ইমামের এবং উসূলে হাদীসের কিতাবসমূহের অসংখ্য উদ্ধৃতি আমাদের কাছে রয়েছে। এখানে শুধু দুটি উদ্ধৃতি পেশ করছি।

১. ইমাম বদরুদ্দীন যারকাশী রহ. উসূলে হাদীসের নির্ভরযোগ্য ও দলীলভিত্তিক কিতাব 'আননুকাত'এ লেখেন–

إِنَّ الْحَدِيْثَ الضَّعِيْفَ إِذَا تَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُوْلِ عُمِلَ بِهِ عَلَى الصَّحِيْحِ، حَتّٰى يُنَزَّلَ مَنْزِلَةَ الْمُتَوَاتِرِ.

"যয়ীফ হাদীস যখন ব্যাপকভাবে উম্মাহর (মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের) কাছে সমাদৃত হয় তখন তার উপর আমল করা হবে– এটাই বিশুদ্ধ কথা। এমনকি তখন তা হাদীসে মুতাওয়াতির (বিপুলসংখ্যক সূত্রে বর্ণিত) হাদীসের পর্যায়ে পৌঁছে যায়।" –আননুকাত আলা-মুকাদ্দিমাতি ইবনিস সালাহ ১/৩৯০

২. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রহ. 'আন্নুকাত আলা-কিতাবি ইবনিস সালাহ' ১/৪৯৪এ লেখেন–

وَمِنْ جُمْلَةِ صِفَاتِ الْقَبُوْلِ أَنْ يَتَّفِقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْعَمَلِ بِمَدْلُوْلِ الْحَدِيْثِ، فَإِنَّه يُقْبَلُ حَتَّى يَجِبَ الْعَمَلُ بِه، وَقَدْ صَرَّحَ بِذٰلِكَ جَمَاعَةٌ مِّنْ أَئِمَّةِ الْأُصُوْلِ.

"হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি হল, ইমামগণ তার বক্তব্যের উপর আমল করতে একমত হওয়া। এ ক্ষেত্রে হাদীসটি গ্রহণ করা হবে এবং এর উপর আমল অপরিহার্য হবে। উসূলের অনেক ইমাম এ বিষয়টি স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন।"

এই সর্বস্বীকৃত নীতিটির আলোকে বিশ রাকাআত তারাবীহ্ বিষয়ক হাদীসটির সনদ এবং মতন (বক্তব্য অর্থাৎ তারাবীর নামায বিশ রাকাআত হওয়ার) বিষয়ে চিন্তা করুন। এর সনদটিতো যয়ীফ কিন্তু বক্তব্য সাহাবা যুগ থেকে নিয়ে প্রতিটিযুগের সম্মিলিত কর্মের মধ্যে বিধৃত। এজন্য উপরোক্ত নীতির আলোকে সনদের দুর্বলতা এখানে কোন প্রভাব ফেলবে না; হাদীসের বক্তব্যটি অসংখ্যসূত্রে বর্ণিত মুতাওয়াতির হাদীসের মতই অবশ্য পালনীয় হবে।

এজন্য অনেক আলেম বিশ রাকাআত তারাবীর আলোচনায় এই হাদীসটিও উল্লেখ করেন। যেহেতু এই হাদীস দ্বারা তাঁদের প্রমাণ গ্রহণ উসূলে হাদীস এবং উসূলে ফিক্‌হের একটি সর্বস্বীকৃত নীতির উপরই ভিত্তিশীল তাই এ ব্যাপারে গায়রে মুকাল্লেদ বন্ধুদের আশ্চর্য হওয়ার কোন সুযোগ নেই। এই হাদীসের ব্যাপারে আরো আলোচনা ইলাউস সুনান ৭/৮২-৮৪; মুহাদ্দিসে কাবীর হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান আজমী রহ.এর কিতাব 'রাকাআতে তারাবীহ ৬৩-৬৯ এবং মাওলানা আমীন সফদর রহ.এর কিতাব 'তাহ্কীকে মাসআলায়ে তারাবীহ' ১/২০৫-২১৩ (মাজমূআয়ে রাসায়েল)এ দেখা যেতে পারে।

এই হাদীসকে গায়রে মুকাল্লেদ বন্ধুরা যদি হাদীসের ইমামগণের অনুসরণ করে 'যয়ীফ' বলে থাকেন তাহলে তাদেরই নীতি অনুসারে এই যয়ীফ হাদীসটি (যা শুধু সনদের বিবেচনায় যয়ীফ) অবশ্য আমলযোগ্য স্বীকার করে নিবেন– এই আশা করা অযৌক্তিক হবে কি?

যাহোক, উপরোক্ত পাঁচ ধরনের অকাট্য দলীলসমূহ এবং আলোচ্য মারফূ হাদীসটির ভিত্তিতে– যা উসূলে হাদীস ও উসূলে ফিক্‌হের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অবশ্য আমলযোগ্য– তারাবীর রাকাআত সংখ্যা বিশ। অন্যান্য ফুকাহায়ে কেরামের মত হানাফী মায্হাবের ফকীহগণের ফত্ওয়া তা-ই। মালেকী মাযহাবে যদিও এই বিষয়ে কিছুটা মতপার্থক্য আছে কিন্তু তা তারাবীর নামায বিশ রাকাআত থেকে কম হবে– এ বিষয়ে নয়। তাদের নিকট বিতরসহ তারাবীর সর্বমোট রাকাআত সংখ্যা ৩৯। –আলমুদাওওনাতুল কুবরা ১/১৯৩

তবে মালেকী মাযহাবের কোন কোন মুহাদ্দিস যেমন ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহ. প্রমুখ তারাবীর নামায ৩৬ রাকাআতের স্থলে ২০ রাকাআত পড়াকেই উত্তম ও অগ্রগণ্য মনে করেন।

গায়রে মুকাল্লেদদের দলীল সম্পর্কে কিছু কথা

এ পর্যন্ত উল্লিখিত দলীলসমূহের বিরোধিতা করে গোটা মুসলিম উম্মাহর অনুসৃত পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে আমাদের যে গায়রে মুকাল্লেদ বন্ধুরা এই নতুনপন্থা উদ্ভাবন করেছেন। (অর্থাৎ শুধু আট রাকাআত পড়া এবং বিশ রাকাআতকে বেদআত বা নাজায়েয আখ্যা দেওয়া।) তারা নিজেদের এই গর্হিত কর্মের কারণে কোথায় অনুতপ্ত হবেন, উল্টো গোটা মুসলিম উম্মাহকেই হাদীস ও সুন্নাহ বিরোধী আখ্যায়িত করতে আরম্ভ করেছেন আর নিজেদের ব্যাপারে হাদীস অনুসরণকারী হওয়ার দাবি করতে শুরু করেছেন! যখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনাদের কাছে তারাবীর নামায আট রাকাআতে সীমাবদ্ধ হওয়া এবং বিশ রাকাআত নাজায়েয হওয়ার পক্ষে কী দলীল রয়েছে? তখন তাদের সর্ব-সাকুল্য পুঁজি যা বের হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

১. একটি সহীহ হাদীস যা তাহাজ্জুদ নামাযের ব্যাপারে এসেছে তারা সেটির অপব্যাখ্যা করে এবং তারাবীর ব্যাপারে প্রয়োগ করে। আর এই প্রয়োগকে বৈধতা দেওয়ার জন্য বলে, তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ এক নামাযেরই দুটি নাম। যে নামায এগারো মাস তাহাজ্জুদ থাকে তাই রমযানে এসে তারাবীহ হয়ে যায়। তাদেরকে যখন চ্যালেঞ্জ দেওয়া হল যে, তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দুটো একই নামায এটা কোন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণ করে দিন এবং এও প্রমাণ করুন যে, তাহাজ্জুদের নামায আট রাকাআতের চেয়ে বেশি পড়া যায় না।

তখন তাদের পক্ষে এই দুটার কোনটাই হাদীস দ্বারা প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি। আর না কখনো সম্ভব হবে। মজার কথা হল, যখন তাদেরকে বলা হয়েছে যে, তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ উভয়টা একই নামায– এ কথাটা সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণ করুন, তখন তারা সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণ করার পরিবর্তে আনওয়ার শাহ্ কাশমীরী রহ.এর কথা দ্বারা প্রমাণ করতে আরম্ভ করেছে! তাদের নীতি যেন এই, যেখানে মানব না সেখানে খুলাফায়ে রাশেদীনকেও মানব না, আর মতলবের জন্য যদি মানতে হয় তাহলে আজকের যুগের কাশমীরীকেও মানতে আপত্তি নেই!

আল্লাহর বান্দারা কাশ্মীরী রহ.এর দলীলহীন কথাটি তো মেনে নিয়েছে, কিন্তু তাঁর উস্তাদগণের উস্তাদ ফকীহুন নফ্স হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. যে স্বতন্ত্র

প্রবন্ধ এ বিষয়ে লিখেছেন এবং তাতে অনেক দলীলপ্রমাণ দ্বারা এই বাস্তবতাকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দুটো ভিন্ন ভিন্ন নামায– এটা আর তাদের নজরে পড়েনি। –তালীফাতে রশীদিয়া ৩০৬-৩২৩

আমাদের এই বন্ধুদের কর্মনীতির আরেকটি আশ্চর্যজনক দিক হল, তারা একদিকে বলছেন তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ একই নামায, অপরদিকে আবার বলছেন তারাবীহ আট রাকাআতের বেশি পড়া নাজায়েয বা বেদআত। অথচ তাহাজ্জুদের ব্যাপারে সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, এর নির্ধারিত কোন রাকাআত সংখ্যা নেই। দুই রাকাআত করে যত রাকাআত ইচ্ছা পড়তে থাকুন এবং যখন সুব্হে সাদেক হওয়ার আশংকা হবে তখন বিতর পড়ে নিন। দেখুন সহীহ বুখারী, হাদীস ১১৩৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৪৯

অন্য হাদীসে এসেছে–

أَوْتِرُوْا بِخَمْسٍ، أَوْ بِسَبْعٍ، أَوْ بِتِسْعٍ، أَوْ بِإِحْدٰى عَشْرَةَ، أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ.

"তোমরা (তাহাজ্জুদ) ও বিত্র পাঁচ রাকাআত পড়, সাত রাকাআত পড়, নয় রাকাআত পড়, এগারো রাকাআত পড় কিংবা তার চেয়ে বেশি পড়।" –সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ২৪২৯; মুস্তাদ্রাকে হাকেম, হাদীস ১১৭৮

ইমাম যাইনুদ্দীন ইরাকী রহ. প্রমুখ বলেছেন যে, হাদীসটি সহীহ। –নাইলুল আওতার, শাওকানী ৩/৪৩; আত্তালখীসুল হাবীর, ইবনে হাজার আসকালানী ২/১৪

তাহাজ্জুদের যে হাদীসটি গায়রে মুকাল্লেদ বন্ধুরা তারাবীর ব্যাপারে ফিট্ করেন তা সহীহ বুখারী ও হাদীসের অন্যান্য কিতাবে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা.এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে এবং রমযানের বাইরে অন্যান্য মাসে চার রাকাআত করে আট রাকাআত এবং তিন রাকাআত বিতর– এই এগারো রাকাআতের চেয়ে বেশি পড়তেন না।

অথচ এটাও তাঁর সবসময়ের আমল ছিল না। কেননা খোদ আম্মাজান আয়েশা রা.এর বর্ণনাতেই তাহাজ্জুদের নামায ফজরের সুন্নত ছাড়া তেরো রাকাআত হওয়াও বর্ণিত আছে। –সহীহ বুখারী, হাদীস ১১৬৪; ফাতহুল বারী ৩/২৬, কিতাবুত তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ১০

অন্যান্য সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের নামায ইশার দুই রাকাআত সুন্নত ও বিতর ছাড়া কখনো কখনো সর্বমোট চৌদ্দ রাকাআত বা ষোল রাকাআত হত। বরং কোন কোন বর্ণনা থেকে আঠারো রাকাআত হওয়াও বোঝা যায়। –নাইলুল আওতার, শাওকানী ৩/২১-২২, হাদীস ৮৯৭; আত্তারাবীহু আক্সারা মিন আলফি 'আম ফিল-মাস্জিদিন নাবাবী, আতিয়্যা মুহাম্মাদ সালেম, সৌদি আরব ২১-২৩

এসব কিছু সত্ত্বেও আমাদের এসব বন্ধুরা একদিকে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদকে এক নামায সাব্যস্ত করছেন, অপরদিকে তারাবীর নামায আট রাকাআতের চেয়ে বেশি পড়াকে নাজায়েয বা বেদআত বলছেন; অথচ তাহাজ্জুদ নামায সহীহ হাদীস অনুসারে আট রাকাআতের বেশি পড়াও জায়েয। তাদের এই অবস্থান সুস্পষ্ট স্ববিরোধিতা নয় কি?

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা.এর হাদীসটির ব্যাপারে তাদের কাছে সর্বশেষ কথা হল, যদি এই হাদীসটি তারাবীর ব্যাপারে হত এবং এতে তারাবীর রাকাআত সংখ্যা নির্ধারণ করাই উদ্দেশ্য হত তাহলে উম্মুল মুমিনীন নিজেই মসজিদে নববীর বিশ রাকাআত তারাবীর উপর আপত্তি উত্থাপন করতেন। ১৪ হিজরী থেকে উম্মুল মুমিনীনের মৃত্যুসন ৫৭ হিজরী পর্যন্ত অবিরাম চল্লিশ বছর তাঁর হুজ্‌রা সংলগ্ন মসজিদে নববীতে বিশ রাকাআত তারাবীহ হয়েছে। উম্মুল মুমিনীন কি কখনো এর উপর আপত্তি করেছেন? তাঁর কাছে তারাবীর রাকাআত সংখ্যার ব্যাপারে একটি অকাট্য হাদীস রয়েছে আর তাঁর সামনে চল্লিশ বছর পর্যন্ত এই হাদীসের বিরোধিতা হচ্ছে, তারপরও তিনি চুপ থাকবেন? কোন আপত্তি করবেন না? এটা কোনভাবেই কি সম্ভব?

বাস্তব কথা হল, সাহাবায়ে কেরামের মাকাম সম্পর্কে অনবগত লোকদের পক্ষে এটা কেন এর চেয়ে অনেক নীচুমানের কথাও মেনে নেওয়া সহজ। নতুবা এটা তো অতি স্পষ্ট কথা যে, যেহেতু হাদীসটির সম্পর্ক তারাবীর রাকাআত সংখ্যার সাথে নয়, তাই তিনি কখনো একে বিশ রাকাআতের বিপরীতে পেশ করেননি।

২. আমাদের এই বন্ধুদের উপস্থাপিত দ্বিতীয় দলীলটি হল ঈসা ইবনে জারিয়া বর্ণনাকৃত একটি হাদীস– যা তিনি হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা.এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন–

صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ رَمَضَانَ لَيْلَةً ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَالْوِتْرَ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْقَابِلَةِ اجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ وَرَجَوْنَا أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا، فَلَمْ نَزَلْ فِيْهِ حَتّٰى أَصْبَحْنَا. قَالَ: إِنِّيْ كَرِهْتُ أَوْ خَشِيْتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الْوِتْرُ.

“রমযানের এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে আট রাকাআত এবং বিতর পড়েন। পরদিন আমরা মসজিদে একত্র হলাম এবং আশা করছিলাম, তিনি আমাদের মধ্যে উপস্থিত হবেন। সকাল পর্যন্ত আমরা এই অবস্থায়ই থাকলাম। নবীজী বললেন, আমি আশংকা করেছি যে, তোমাদের উপর বিতর ফরয করে দেওয়া হবে।”

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ গ্রহণের প্রচেষ্টা এজন্য ঠিক নয় যে, ঈসা ইবনে জারিয়া একজন যয়ীফ রাবী। কতিপয় ইমাম তাকে মাতরূক (পরিত্যাজ্য, যার বর্ণনা দলীল বা

সমর্থক দলীল কোন ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য নয়) এবং মুনকারুল হাদীস (ভুল ও আপত্তিকর কথাকে হাদীস হিসেবে, ভুলক্রমে বা ইচ্ছাকৃতভাবে বর্ণনাকারী) পর্যন্ত বলেছেন।

ইমাম ইবনে আদী রহ. তার উপরোক্ত হাদীসটিকে 'গায়রে মাহফূয' সাব্যস্ত করেছেন। ইবনে আদী রহ.এর পরিভাষায় 'গায়রে মাহফূয' শব্দটি মুন্‌কার বা বাতিল রেওয়ায়াতের ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়। 'মুনকার' যয়ীফ হাদীসের একটি নিম্নমানের প্রকার যা দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ বৈধ নয়।

দেখুন, তাহযীবুল কামাল ১৪/৫৩৩-৫৩৪; আলকামিল ইবনে আদী ৬/৪৩৬; আয্‌যুয়াফাউল কাবীর, উকাইলী ৩/৩৮৩; ইত্‌হাফুল মাহারাহ বিআত্‌রাফিল আশারাহ, ইবনে হাজার ৩/৩০৯

এছাড়া এ রেওয়ায়াতে একথার উল্লেখ আছে যে, এটি রমযানের এক রাতের ঘটনা। যেহেতু সে সময় তারাবীর নামায জামাআতের সাথে পড়ার প্রচলন ছিল না, তাই এ রেওয়ায়াতটিকে সহীহ ধরে নেওয়া হলেও এ বিষয়টি খুবই সম্ভব যে বাকি রাকাআতগুলো জামাআত ছাড়া একাকী পড়ে নেওয়া হয়েছে। এটা শুধু অনুমানের কথা নয়, সহীহ মুসলিমে এ ধরনের এক ঘটনায় পরিষ্কার উল্লেখ আছে যে, فَصَلَّى صَلَاةً لَمْ يُصَلِّهَا عِنْدَنَا. 'এরপর কিছু নামায পড়েছেন, যা আমাদের কাছে পড়েননি।' -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১০৪

মোটকথা এধরনের একটি মুনকার এবং অতিদুর্বল রেওয়ায়াত (উপরন্তু যা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা এবং আসল বিষয়ে অস্পষ্ট) দ্বারা উপরোক্ত অকাট্য দলীলসমূহের বিরোধিতা করা একদম ভুল। ভাবার বিষয় হল, যদি এই হাদীস সহীহ হত এবং এর দ্বারা তারাবী আট রাকাআত হওয়া প্রমাণিত হত তাহলে হযরত জাবের রা.ই সর্বপ্রথম বিশ রাকাআতের বিপক্ষে এই হাদীসটি পেশ করতেন।

৩. তৃতীয় যে 'বস্তু' তাদের কাছে আছে তা-ও এই ঈসা ইবনে জারিয়ার বিকৃত একটি ঘটনা যা হযরত উবাই ইবনে কা'বএর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ এর বর্ণনাসূত্রে সেই ঈসা ইবনে জারিয়া রয়েছে, যে নেহায়েত যয়ীফ আবার এটি যে তারাবীর ব্যাপারে তারও কোন প্রমাণ নেই। খুবই সম্ভব যে ঘটনাটি তাহাজ্জুদের ব্যাপারে ঘটেছিল। আবার তা রমযানে হয়েছিল কিনা তাও সন্দেহপূর্ণ।

এসব বিষয়গুলো আরো বিস্তারিতভাবে জানতে হলে মুহাদ্দিস হাবীবুর রহমান আজমী রহ.এর রাকাআতে তারাবীহ (৪০-৪৩) অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

এখানেও এ বিষয়টি মনোযোগের দাবি রাখে যে, যদি এই হাদীসটি সহীহ হত এবং এতে তারাবীর রাকআত সংখ্যাই উল্লেখিত থাকত তাহলে হযরত উবাই ইবনে

কা'ব রা. যখন তারাবীর ইমাম হন তখন আট রাকাআতই পড়াতেন, বিশ রাকাআত পড়াতেন না। এসব বিষয় এবং অন্যান্য দলীলের ভিত্তিতে এটিই প্রমাণিত হয় যে, উপরোক্ত হাদীস দুটি যয়ীফ রাবী ঈসা ইবনে জারিয়ার স্মরণ শক্তিজনিত দুর্বলতা থেকেই সৃষ্ট এবং এই রেওয়ায়াত দুটি তার ওই সব ভুল বর্ণনারই অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোর কারণে হাদীসশাস্ত্রের ইমামগণ তাকে 'মুনকারুল হাদীস' বা মাতরূক সাব্যস্ত করেছেন।

আফসোসের বিষয় হল, আমাদের গায়রে মুকাল্লেদ বন্ধুরা যয়ীফসূত্রে বর্ণিত ওই হাদীসটিকে তো পরিত্যাগ করেন– যার বক্তব্য সঠিক এবং অন্যান্য অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে সহীহ হিসেবে প্রমাণিত– আর যয়ীফ হাদীসকে গ্রহণ করে নেন– যার সনদ 'অতিযয়ীফ' হওয়ার পাশাপাশি তার বক্তব্যটিও দলীলের ভিত্তিতে 'মুনকার' বা ভুল হওয়া প্রমাণিত।

৪. চতুর্থ এবং সর্বশেষ যে বস্তুটি তাদের কাছে রয়েছে তাও একটি ভুল বিবরণ। এক বর্ণনাকারী হযরত উমর রা.এর যুগের নামাযের বিবরণ দিচ্ছিল। সে ভুলক্রমে বিশের স্থলে এগারো রাকাআতের কথা বলে বসে। ব্যাস, আমাদের গায়রে মুকাল্লেদ বন্ধুরা এটাকেই তাদের দলীল বানিয়ে নেন। অথচ হযরত উমর রা.এর যুগে তারাবীর নামায বিশ রাকাআত হওয়ার বিষয়টি সকল দ্বিধা-সংশয়ের ঊর্ধ্বে। এটা অনেক সহীহ রেওয়ায়াত, ইজমা ও ব্যাপক কর্মের মাধ্যমে প্রমাণিত। ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহ. এবং অন্যান্য মুহাক্কিক আলেমগণ বলেছেন যে, বিশের স্থলে এগারো বলা বর্ণনাকারীর ভুল। দেখুন– আলইসতিযার ৫/১৫৬; রাকাআতে তারাবীহ ১২-২০

খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত, মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণের ইজ্মা, অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের ইজমা এবং অন্য সব অকাট্য দলীলের বিপরীতে তাদের কাছে এই চার 'বস্তু' রয়েছে। যার একটি হল তাহাজ্জুদের হাদীস যা জোর-জবরদস্তি তারাবীর ব্যাপারে প্রয়োগ করেন। দুটি মুনকার ও অতিদুর্বল রেওয়ায়াত যা বর্ণনাগত দিক থেকে ভুল হওয়ার পাশাপাশি মূলবিষয়েই অস্পষ্ট আর সবশেষে একজন রাবীর ভুল বিবরণ, যে বিশের স্থলে এগারো উল্লেখ করেছে।

সহীহ হাদীসের অপব্যাখ্যা করে এবং তিনটি মুনকার ও ভুল বর্ণনা নিয়েই তারা গোটা উম্মতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে নেমে পড়েছেন এবং বিশ রাকাআতকে নাজায়েয, বেদআত এবং সহীহ হাদীসসমূহের বিরোধী ঘোষণা করছেন!

কত ভাল হত, যদি তারা তাদের এই ভুল সিদ্ধান্তটির ব্যাপারে দ্বিতীয়বার চিন্তাভাবনা করতেন এবং মৃত্যুর আগেই এই ভুলের সংশোধন করে নিতেন এবং মুসলিম উম্মাহর এই সুবিশাল অংশের বিরোধিতা করে সিরাতে মুসতাকীম থেকে বিচ্যুত না হতেন!

বিশেষ সতর্কীকরণ

তারাবীর রাকাআত-সংখ্যা-বিষয়ক এই আলোচনার পর– যা বর্তমান-প্রেক্ষিতে কিছুটা দীর্ঘ হয়েছে– আমরা মুসল্লী ভাইদেরকে একটি বিশেষ নসীহত পেশ করতে চাই। তা হল আমরা যেন সেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অমনোযোগিতা থেকে বেঁচে থাকি যেগুলো অনেক মসজিদেই দেখা যায়। যেমন, নামায তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য রুকূ, কওমা, জল্‌সা, সেজ্‌দা ইত্যাদিতে তাড়াহুড়া করা। কেননা নামায ফরয হোক বা নফল, তার মধ্যে রুকূ, সেজদা, কওমা, জলসা ইত্যাদি ইতেদালের সাথে শান্তভাবে আদায় করা ওয়াজিব। এছাড়া নামায শুদ্ধ হবে না। এজন্য শান্তভাবে নামায আদায় করা জরুরি।

অনুরূপ তারাবীতে এত তাড়াতাড়ি কুরআন তেলাওয়াত করা হয় যে, দ্রুততার কারণে শব্দাবলিও ঠিকমত বোঝা যায় না। বলাবাহুল্য এতদ্রুত পড়ে খতম করার চেয়ে খতমের ফিকির না করে শান্তভাবে অল্প অল্প করে পড়াই উত্তম।

এধরনের আরো কিছু ত্রুটি আছে যা থেকে বেঁচে সহীহ পদ্ধতিতে নামায এবং কুরআন তেলাওয়াতের আমলটি করা জরুরি। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে তাওফীক দিন, আমীন।

ভাষান্তর ঃ মাওলানা যাকারিয়া আব্দুল্লাহ

সহীহ্ হাদীসের আলোকে
ঈদের নামায

بسم الله الرحمن الرحيم

সহীহ হাদীসের আলোকে ঈদের নামায

রমযানের রোযা এবং এ মাসের অন্যান্য খায়ের-বরকতের শোকরানা ছাড়াও আরো অনেক হেকমতের কারণে ঈদুল ফিতরের নামাযের হুকুম দেওয়া হয়েছে। কুরআন মাজীদের সূরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতে এই নামাযের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসংখ্য হাদীসে এর তাকিদ করেছেন, সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে এই নামায আদায় করেছেন এবং মৌখিক নির্দেশনা ও বাস্তবে সম্পাদনের মাধ্যমে এর নিয়মকানুন শিক্ষা দিয়েছেন। এখানে সংক্ষেপে এই নামাযের নিয়ম-পদ্ধতি উল্লেখ করছি।

ঈদের নামাযের সংক্ষিপ্ত নিয়ম

১. ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহা কোন নামাযেই আযান-ইকামত নেই। এই দুই নামাযে জামাআত অপরিহার্য, কিন্তু আযান-ইকামত বিধিবদ্ধ নয়। –সহীহ বুখারী, হাদীস ৯৬০; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮৮৬

২. উভয় ঈদের নামায ঈদগাহ বা খোলা মাঠে আদায় করা মাসনূন। –সহীহ বুখারী, হাদীস ৯৫৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮৮৯

বিনা ওযরে এই নামায মসজিদে আদায় করা অনুচিত ।

৩. উভয় ঈদের নামায দুই রাকাআত করে। এর আগে-পরে কোন সুন্নত বা নফল নামায নেই। –সহীহ বুখারী, হাদীস ৯৮৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮৮১; মুসনাদে আহমদ, ২/৫৭, হাদীস ৫১৯০

৪. ঈদের নামায আদায় করার নিয়ম হল, প্রথমে মনে মনে ঈদের নামাযের নিয়ত করবে। এরপর 'আল্লাহু আকবার' বলে কানের লতি পর্যন্ত হাত ওঠাবে। তারপর হাত বাঁধবে ও সানা পড়বে। সানা পড়া শেষ হলে 'আল্লাহু আকবার' বলবে এবং তাকবীর বলার সময় উভয় হাত কানের লতি পর্যন্ত ওঠাবে; এরপর হাত ছেড়ে দিবে। দুই-এক

বার 'সুব্‌হানাল্লাহ' পড়া যায় এ পরিমাণ সময় অপেক্ষা করে দ্বিতীয়বার তাকবীর দিবে এবং উভয় হাত কানের লতি পর্যন্ত ওঠাবে, এরপর হাত ছেড়ে দিবে। এবারও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে কানের লতি পর্যন্ত হাত ওঠাতে ওঠাতে তাকবীর দিবে এবং হাত বেঁধে নিবে। এবার যথানিয়মে আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ পড়ে ইমাম সাহেব সূরা ফাতেহা পড়বেন এবং অন্য একটি সূরা মিলাবেন। আর মুক্তাদীরা চুপ থাকবে। তারপর যথানিয়মে তাকবীর দিয়ে রুকূতে যাবে এবং রুকূ-সেজদা সমাপ্ত করে দ্বিতীয় রাকাআতের জন্য দাঁড়াবে।

দ্বিতীয় রাকাআতে ইমাম সূরা ফাতেহা ও অন্য একটি সূরা পড়বেন। আর মুক্তাদীরা চুপ থাকবে। ইমামের কেরাআত সমাপ্ত হওয়ার পর রুকূতে যাওয়ার আগে আগের নিয়মে তিনটি বাড়তি তাকবীর দিবে এবং চতুর্থ তাকবীর দিয়ে রুকূতে যাবে। নামাযের অন্যান্য তাকবীরের মত বাড়তি ছয় তাকবীরও ইমাম-মুক্তাদী উভয়ই দিবে, তবে ইমাম উচ্চস্বরে ও মুক্তাদীরা অনুচ্চস্বরে তাকবীর দিবে। এরপর যথানিয়মে নামায শেষ করবে।

একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে, প্রথম রাকাআতে তাকবীরে তাহ্‌রীমা ও রুকূর তাকবীরসহ মোট তাকবীর পাঁচটি। রুকূর তাকবীর হিসাব থেকে বাদ দিলে তাকবীর হয় চারটি। দ্বিতীয় রাকাআতে রুকূর তাকবীরসহ মোট তাকবীর চারটি। তাকবীর বিষয়ক হাদীসসমূহ সামনে উল্লেখিত হবে।

৫. ঈদের নামাযে যাহ্‌রী (উচ্চস্বরে) কেরাআত পড়তে হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের নামাযে কখনো সূরা 'আ'লা' ও সূরা 'গাশিয়াহ' আর কখনো সূরা 'কাফ' ও সূরা 'কামার' পড়তেন। –সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৮৭, ৮৯১

৬. নামায শেষ হওয়ার পর দাঁড়িয়ে আরবী ভাষায় দুটি খুতবা দেওয়া মাসনূন এবং দুই খুতবার মাঝে বসাও মাসনূন। ঈদের খুতবা নামাযের পরে হবে, নামাযের আগে নয়। –সহীহ বুখারী, হাদীস ৯৬২, ৯৬৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮৮৪; সুনানে ইবনে মাজা, হাদীস ১২৮৯; মুসনাদুশ শাফেয়ী (কিতাবুল উম্ম) ৫/৪৭৩

কতিপয় গায়রে মুকাল্লেদ ভাইয়ের এই বক্তব্য 'দুই ঈদে একটি করে খুতবা হবে' সহীহ হাদীস ও মুসলিম উম্মাহর সর্ববাদীসম্মত কর্মের পরিপন্থী।

ঈদের নামাযে মোট তাকবীর কয়টি হবে

প্রথমেই বলা হয়েছে যে, প্রথম রাকাআতে তাকবীরে তাহ্‌রীমা, অতিরিক্ত তাকবীর ও রুকূর তাকবীর সবমিলে পাঁচ তাকবীর হয়। রুকূর তাকবীর বাদ দিলে ফাতেহা ও সূরার আগে যে তাকবীরসমূহ থাকে তা চারটি। আর দ্বিতীয় রাকাআতে ফাতেহা ও সূরা

সমাপ্ত হওয়ার পর যে তাকবীরসমূহ হয় রুকূর তাকবীরসহ তার সংখ্যা চার। তাহলে এক হিসাবে প্রতি রাকাআতে তাকবীর সংখ্যা চারটি করে মোট আটটি। আর অপর হিসাবে প্রথম রাকাআতে পাঁচ এবং দ্বিতীয় রাকাআতে চার সর্বমোট নয় তাকবীর হবে। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত তাকবীর হচ্ছে তিনটি করে ছয়টি। বাকিগুলো তাকবীরে তাহরীমা ও রুকূর তাকবীর। এবার এ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ লক্ষ করুন–

١. عَنِ الْقَاسِمِ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلّٰى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيْدٍ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَأَرْبَعًا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ حِيْنَ انْصَرَفَ فَقَالَ: لاَ تَنْسَوْا، كَتَكْبِيْرِ الْجَنَائِزِ، وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ، وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ.

رَوَاه الطَّحَاوِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنُ الإِسْنَادِ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ وَيَحْيٰى بْنُ حَمْزَةَ وَالْوَضِيْنُ وَالْقَاسِمُ كُلُّهُمْ أَهْلُ رِوَايَةٍ مَعْرُوْفُوْنَ بِصِحَّةِ الرِّوَايَةِ، لَيْسَ كَمَنْ رَوَيْنَا عَنْهُ الآثَارَ الأُوَلَ. فَإِنْ كَانَ هٰذَا الْبَابُ مِنْ طَرِيْقِ صِحَّةِ الإِسْنَادِ يُؤْخَذُ فَإِنَّ هٰذَا أَوْلٰى أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ مِمَّا خَالَفَهُ غَيْرُهُ. قَالَ الرَّاقِمُ: أَرَادَ بِالْحَسَنِ الصَّحِيْحَ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ وَالْوَاقِعُ وَلَمْ يَكُنْ الطَّحَاوِيُّ مِمَّنْ يُفَرِّقُ بَيْنَ الصَّحِيْحِ وَالْحَسَنِ.

১. "প্রসিদ্ধ তাবেয়ী আবু আব্দুর রহমান কাসেম (ইবনে আব্দুর রহমান) বলেন, আমাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবীজী ঈদের দিন আমাদের নামায পড়ান এবং চারটি করে তাকবীর দেন। নামায শেষে আমাদের দিকে তাকিয়ে ইরশাদ করেন, ভুলো না যেন। তারপর হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি বন্ধ করে বাকি চার অঙ্গুলি দিয়ে ইঙ্গিত করে বললেন, জানাযার তাকবীরের মত (ঈদের নামাযেও চারটি করে তাকবীর হয়ে থাকে)।" –তহাবী শরীফ ২/৩৭১ (কিতাবুয যিয়াদাত ১ম বাব)

এই হাদীসটি সহীহ এবং এর সকল রাবী 'সিকাহ' নির্ভরযোগ্য। ইমাম তহাবী রহ.এর ভাষ্য অনুযায়ী এঁদের বর্ণনাসমূহ সহীহ হওয়া একটি প্রসিদ্ধ কথা। ইমাম তহাবী রহ. এও বলেছেন যে, এই হাদীসের সনদ ওই সব হাদীসের সনদ থেকে অধিক সহীহ যেখানে বারো তাকবীরের কথা উল্লেখ আছে।

٢. عَنْ مَكْحُوْلٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوْ عَائِشَةَ جَلِيْسٌ لِأَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ سَأَلَ أَبَا مُوْسَى الْأَشْعَرِيَّ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانَ

كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِيْ الأَضْحٰى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ أَبُوْ مُوْسٰى : كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيْرَهُ عَلٰى الْجَنَائِزِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: صَدَقَ، فَقَالَ أَبُوْ مُوْسٰى: كَذٰلِكَ كُنْتُ أُكَبِّرُ فِي الْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ. قَالَ أَبُوْ عَائِشَةَ: وَأَنَا حَاضِرٌ سَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ. وَفِيْ رِوَايَةِ ابْنِ أَبِيْ شَيْبَةَ فِيْ «الْمُصَنَّفِ» زِيَادَةٌ : فَمَا نَسِيْتُ قَوْلَهُ أَرْبَعًا كَالتَّكْبِيْرِ عَلَى الْجَنَازَةِ.

أخرجه أحمد في «مسنده» ٤١٦:٤، وأبو داود في «سننه» ١: ١٦٣.

২. "(প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ইমাম) মাকহুল (দামেস্কী) বলেছেন, আমাকে আবু হুরায়রা রা.এর একজন সঙ্গী আবু আয়েশা (আলউমাভী) জানিয়েছেন যে, (কুফার আমীর) সাঈদ ইবনুল 'আস আবু মূসা আশআরী রা. ও হুযায়ফা রা.কে জিজ্ঞেস করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল আযহা এবং ঈদুল ফিতর-এ কয় তাকবীর দিতেন? আবু মূসা রা. উত্তরে বলেন, জানাযার তাকবীরের সমসংখ্যক (চার) তাকবীর দিতেন। হুযায়ফা রা. (আবু মূসা রা.এর সমর্থনে) বললেন, তিনি ঠিক বলেছেন। আবু মূসা রা. আরো বললেন, আমি যখন বসরার আমীর হিসেবে সেখানে অবস্থান করছিলাম তখন আমি সেখানে এভাবে চার তাকবীর দিতাম।

আবু আয়েশা বলেন, সাঈদ ইবনুল 'আসের এই প্রশ্নের সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তিনি আরো বলেন, আবু মূসা রা.এর বাক্য 'জানাযার মত চার তাকবীর' এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে।" –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১১৫০; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ২/৭৮, কিতাবু সালাতিল ঈদাইন, বাব নং ১২

সনদের বিবেচনায় এই হাদীসটি 'হাসান' পর্যায়ের এবং হাসান হাদীস গ্রহণযোগ্য হাদীসেরই একটি প্রকার। –আসারুস সুনান ৩১৪ (১)

---

(١) الحديث سكت عليه أبو داود ثم المنذري بعده، فأقل أحواله أن يكون صالحا للعمل، وقال النيموي في «آثار السنن» ص ٣١٤: «إسناده حسن». ولا وجه لإعلاله بابن ثوبان فإن الراجح فيه التوثيق، وما فيه من جرح لا ينزله عن درجة الحسن، ولذا ذكره الذهبي في رسالته: «من تكلم فيه وهو موثق» ص ١٣٣، وأبو عائشة من التابعين من طبقة الحسن وابن سيرين، وهو قرشي أموي، وناهيك أنه كان جليسا لأبي هريرة، وروى عنه إمامان : مكحول وخالد بن معدان، فهو أرفع مما قيل في التقريب من أنه مقبول، ولحديثه هذا شواهد صحيحة من مرفوع وموقوف

وأما إعلال البيهقي قائلا: «والمشهور أنهم أسندوا أمرهم إلى ابن مسعود فأفتاه...، ولو

সাহাবায়ে কেরামের ফত্ওয়া ও আমল

৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন, দুই ঈদের নামাযে (প্রতি রাকাআতে) জানাযার মত চার তাকবীর হবে। –আলমু'জামুল কাবীর, তবরানী ৯/৩০৫, হাদীস ৯৫২২

রেওয়ায়াতটির সনদ 'সহীহ'। হাইসামী মাজমাউয যাওয়ায়েদে (২/৪২২) বলেছেন, رجاله ثقات 'রেওয়ায়াতটির রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।'

জানাযার মত দুই ঈদের তাকবীর চারটি হওয়ার ব্যাখ্যা খোদ ইবনে মাসউদ রা.এর বিভিন্ন আলোচনায় বিদ্যমান রয়েছে। এখানে তার একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করা হল–

عَنْ كُرْدُوْسٍ قَالَ: أَرْسَلَ الْوَلِيْدُ إِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَحُذَيْفَةَ وَأَبِيْ مَسْعُوْدٍ وَّأَبِيْ مُوْسٰى الْأَشْعَرِيِّ بَعْدَ الْعَتَمَةِ، فَقَالَ: إِنَّ هٰذَا عِيْدُ الْمُسْلِمِيْنَ، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ؟ فَقَالُوْا: سَلْ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: يَقُوْمُ فَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ مِّنَ الْمُفَصَّلِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْكَعُ، فَتِلْكَ خَمْسٌ، ثُمَّ يَقُوْمُ، فَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ مِّنَ الْمُفَصَّلِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا يَرْكَعُ فِيْ آخِرِهِنَّ، فَتِلْكَ تِسْعٌ فِي الْعِيْدَيْنِ، فَمَا أَنْكَرَهُ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ.

رَوَاهُ الطَّبْرَانِي، وَقَالَ الْهَيْثَمِيُّ فِي «مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ» ٢: ٢٠٥: رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَقَالَ النَّيْمَوِيُّ فِي «آثَارِ السُّنَنِ» ص ٣١٥: «إِسْنَادُهُ حَسَنٌ». وَلَهُ شَوَاهِدُ كَثِيْرَةٌ بِأَسَانِيْدَ صَحِيْحَةٍ.

"কুরদূস রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওয়ালীদ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা., হুযায়ফা রা., আবু মাসউদ রা. এবং আবু মূসা আশআরী রা.এর কাছে ইশার নামাযের পর একথা জিজ্ঞেস করার জন্য লোক পাঠাল যে, মুসলিমজাতির ঈদ অত্যাসন্ন। এর নামাযের নিয়ম কী হবে? (সাহাবীগণ) সবাই (দূতকে) বললেন, আবু আব্দুর রহমান

كان عند أبي موسى فيه علم عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسأل ابن مسعود »، ففيه نظر واضح، فالقصتان مختلفتان، احداهما لم يشهدها ابن مسعود، راجع سياقهما في المصنف لابن أبي شيبة وغيره، وكان من شأن الصحابة عند الإفتاء أو التحديث الإحالة على غيره، ولو كان عنده علم، وهذا معروف من أمرهم، وأما أبو موسى الأشعري فهو القائل: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. يريد عبد الله بن مسعود.

(আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ)কে জিজ্ঞেস করুন। লোকটি তাঁকে জিজ্ঞেস করল, তিনি উত্তরে বললেন, (নামাযে) দণ্ডায়মান হবে এবং চার তাকবীর দিবে। এরপর সূরা ফাতেহা ও অন্য একটি সূরা তেলাওয়াত করবে। তারপর রুকূর তাকবীর দিয়ে রুকূ করবে। (প্রথম রাকাআতে) এই পাঁচ তাকবীর হল। তারপর (দ্বিতীয় রাকাআতের জন্য) উঠবে এবং সূরা ফাতেহা ও অন্য একটি সূরা তেলাওয়াত করবে। তারপর চার তাকবীর দিবে ও শেষ তাকবীরের সময় রুকূ করবে। (দুই রাকাআতে) সর্বমোট নয় তাকবীর হল। (এটাই) দুই ঈদের (নিয়ম)। উপস্থিত সাহাবীগণ কেউই তার সাথে দ্বিমত করেননি।

উপরোক্ত বর্ণনায় ঈদের তাকবীরের যে নিয়ম আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. অপর তিন সাহাবীর উপস্থিতিতে শিক্ষা দিয়েছেন এই একই নিয়ম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা., হযরত আনাস রা. এবং হযরত মুগীরা ইবনে শুবা রা. থেকেও 'সহীহ' সনদে বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের রেওয়ায়াতসমূহ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ২/৭৯-৮১; মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক ৩/২৯৪-২৯৫ এবং তহাবী শরীফ ২/৩৭২-৩৭৩-এ পাওয়া যাবে। এছাড়া হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা., হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. থেকেও এই নিয়ম বর্ণিত হয়েছে। তবে শেষোক্ত তিন সাহাবীর রেওয়ায়াতে সাধারণ কিছু আপত্তির সুযোগ আছে।

ঈদের তাকবীর প্রসঙ্গে 'সাহাবায়ে কেরামের ফত্ওয়া ও আমল' শিরোনামে যে আলোচনা চলছে এ ব্যাপারে একটি মৌলিক কথা মনে রাখা খুব জরুরি তা হল নামাযে তাকবীর কয়টি হবে– এ এমন কোন বিষয় নয় যা কিয়াস ও যুক্তির ভিত্তিতে নির্ধারণ করা যায়। কেননা, ইবাদতের নিয়মপদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে ওহীর উপর নির্ভরশীল। তাই এ বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের কোন শিক্ষা কেবল কিয়াসের ভিত্তিতে হওয়া সম্ভবপর নয়। এর বুনিয়াদ হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা। বলাবাহুল্য, উপরোক্ত সাহাবীগণকে ঈদের নামাযের নিয়মপদ্ধতি নবীজীই শিখিয়েছেন এবং তাঁরা পরবর্তী ব্যক্তিদেরকে সেই নিয়মই শিক্ষা দিয়েছেন। এজন্য ঈদের নামাযের তাকবীর প্রসঙ্গে যে নিয়ম আমরা একাধিক সাহাবীর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছি একে তাঁদের কিয়াস বা যুক্তিনির্ভর মত আখ্যা দেওয়া– যা আমাদের অনেক গায়রে মুকাল্লেদ ভাইদের অভ্যাস– একটি মারাত্মক অন্যায়। এধরনের কথাবার্তা সাহাবায়ে কেরামের শানে বেআদবির শামিল। কেননা তাদের কথার অর্থ এই দাঁড়াচ্ছে যে, সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেখানো পদ্ধতি পরিত্যাগ করে নিজেদের মনমতো একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক।

তাছাড়া এই শিরোনামের আগের শিরোনামে সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দুটি হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে। এরপর তো আর কোন কথাই বাকি

থাকা উচিত নয়। কিন্তু আপনি ওই সব বন্ধুদের কাছে যান। দেখবেন তারা এই সহীহ হাদীসগুলোকে 'যয়ীফ' প্রমাণ করার জন্য যেন মরণপণ করে আছেন। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে হেদায়াত নসীব করুন।

ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহ. 'মুয়াত্তা'এর দুটি অতুলনীয় ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আত্তাম্হীদ' ১৬/৮৭ ও 'আলইস্তিযকার' ৭/৪৯এ এধরনের এক প্রসঙ্গে বড় সুন্দর কথা লিখেছেন–

وَمَعْلُوْمٌ أَنَّ هٰذَا وَمَا كَانَ مِثْلَهُ لَا يَكُوْنُ رَأْيًا، لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ مِنْ جِهَةِ الرَّأْيِ وَالْاِجْتِهَادِ بَيْنَ سَبْعٍ فِيْ هٰذَا وَأَرْبَعٍ، وَلَا يَكُوْنُ إِلَّا تَوْقِيْفًا مِمَّنْ يَجِبُ التَّسْلِيْمُ لَهُ.

"যুক্তির বিচারে 'সাত' এবং 'চার'এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এজন্য এ ধরনের বিষয় কিয়াস বা যুক্তিনির্ভর হতে পারে না। এটা একমাত্র ওহীপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার ভিত্তিতেই হতে পারে।"

সারকথা, দুই ঈদের নামাযের পদ্ধতি এবং তাকবীর সংখ্যা– যা ফিক্হে হানাফীতে বলা হয়েছে এবং যে মোতাবেক অসংখ্য মানুষ ঈদের নামায আদায় করছে– তার ভিত্তি প্রথমত সহীহ হাদীসের উপর এবং দ্বিতীয়ত সাহাবায়ে কেরামের শিক্ষার উপর নববী শিক্ষাই যার উৎস।

সাহাবায়ে কেরাম থেকে তাবেয়ীগণ নামায শিখেছেন। আপনি হাদীস ও আসারের সংকলনসমূহ হাতে নিন, শুধু মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা এবং শরহু মাআনিল আসার'ই পড়ে দেখুন, সেখানে অনেক তাবেয়ী ইমামকে এই নিয়ম শিক্ষা দিতে এবং এই ফত্ওয়া দিতেই দেখবেন, যা বিভিন্ন হাদীস ও আসারের উদ্ধৃতিতে আমরা ইতিপূর্বে লিখে এসেছি।

আশ্চর্যের ব্যাপার হল, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে একটি পদ্ধতি মুসলিম উম্মাহর অসংখ্য মুহাদ্দিস ও ফকীহ এবং অগণিত আলেম উলামার মাধ্যমে অনুসৃত হয়ে আসছে আর আমাদের গায়রে মুকাল্লেদ বন্ধুরা কলমের এক খোঁচাতেই তাকে 'গলদ' সাব্যস্ত করে ফেলছেন অথবা হুট করে বলে বসছেন যে, এই পদ্ধতি কিয়াস-নির্ভর। এর স্বপক্ষে না কোন সহীহ হাদীস আছে, আর না কোন যয়ীফ হাদীস। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে হেদায়াত নসীব করুন এবং চোখের জ্যোতি ও দিলের নূর উভয়টাই দান করুন। যাতে তারা হাদীসের কিতাবসমূহে উল্লিখিত হাদীস ও আসারসমূহ দেখতে পান এবং তার মর্ম অনুধাবন করতে সক্ষম হন।

---

(١) وذلك إذا اعترفوا بمنهج أئمة الحنفية في النقد، وأما علي طريقة إخواننا غير المقلدين في جرح أدلة أئمة الفقه فتلك ضعيفة بالطريق الأولى كما يعلمون هم أنفسهم.

তাকবীর বিষয়ক ইখতেলাফের ধরন

সবশেষে এই বিষয়টিও স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, সাহাবায়ে কেরাম থেকে ঈদের নামাযের তাকবীর সংক্রান্ত আরো কিছু নিয়ম বর্ণিত আছে। সেসব নিয়মের মধ্যে বারো তাকবীরের নিয়মটিই সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। প্রথম রাকাআতে তাকবীরে তাহরীমাসহ বা তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া (দুটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা অনুসারে) সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাআতে পাঁচ তাকবীর। এই পদ্ধতিতে উভয় রাকাআতে তাকবীরসমূহ কেরাআতের আগে বলতে হয়। ফিক্‌হের বেশ কয়েকজন ইমাম এই পদ্ধতিটি অবলম্বন করেছেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আবু হুরায়রা রা., হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. এবং অন্য দুএকজন সাহাবী থেকে এই পদ্ধতিটি বর্ণিত হয়েছে এবং এর সমর্থনে হাসান পর্যায়ের দুএকটি মারফূ হাদীসও রয়েছে। (১)

বারো তাকবীরের কথাও যেহেতু হাদীস শরীফে আছে, তাই এটিও একটি জায়েয পন্থা। কোন দেশে বা কোন ঈদগাহে যদি এই পদ্ধতিতে নামায হয় তাহলে সেখানে আপত্তি করার প্রয়োজন নেই। ঝগড়া-বিবাদের তো প্রশ্নই আসে না। মনে রাখতে হবে, এ মাসআলার মধ্যে যে মতভেদ তা জায়েয-নাজায়েয নিয়ে নয়; বরং কোন্ পদ্ধতিটি উত্তম তা নিয়ে। এ প্রসঙ্গে ফিক্‌হে হানাফীর প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান শাইবানী রহ, 'মুয়াত্তা'এ বলেন, দুই ঈদের তাকবীরের ব্যাপারে ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে। সুতরাং তুমি যেটাই গ্রহণ করবে সেটাই ভাল, তবে আমাদের মতে সেই নিয়মটিই উত্তম যা হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত রয়েছে। তিনি প্রত্যেক ঈদে নয় তাকবীর বলতেন, প্রথম রাকাআতে তাকবীরে তাহরীমা ও রুকূর তাকবীরসহ পাঁচ তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাআতে রুকূর তাকবীরসহ চার তাকবীর। প্রথম রাকাআতের কেরাআত তাকবীরের পরে এবং দ্বিতীয় রাকাআতের কেরাআত তাকবীরের আগে পড়তেন। এটাই আবু হানীফা রহ.এর মত।" –মুয়াত্তা মুহাম্মাদ ১৪১

ফিক্‌হে হাম্বলীর প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.ও বলেছেন যে, ঈদের তাকবীর প্রসঙ্গে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ ছিল। তাঁদের অনুসৃত পন্থাগুলোর যে কোনটিই অবলম্বন করা যায়। –ফাতহুল বারী, ইবনে রজব হাম্বলী ৬/১৭৯

ফিক্‌হে মালেকীর সুবিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহ. এই মতভেদের ব্যাপারে বলেন, এসব পদ্ধতির সবগুলোই জায়েয। কোনটিতেই কোন অসুবিধা নেই। সকল পদ্ধতিই সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেই গ্রহণ করেছেন। –আলইস্‌তিয্‌কার ৭/৫৪

ফিক্‌হে হাম্বলীর প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ.ও তাকবীরের

এই মতভেদকে শুধু উত্তম নির্ণয়ের মতভেদ সাব্যস্ত করেছেন এবং বলেছেন, এর একটি পদ্ধতি অবলম্বন করে অপর পদ্ধতিকে ভুল বলা বা তার ব্যাপারে আপত্তি করা একটি ভ্রান্তি। –মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ২৪/২২৪; রিসালাতুল উলফা বাইনাল মুসলিমীন, ইবনে তাইমিয়া ৪৫-৪৮, ৫৯-৬২

কত ভাল হত যদি আমাদের গায়রে মুকাল্লেদ বন্ধুগণ ইবনে তাইমিয়া রহ.এর এই অবস্থান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতেন! তারা তো নিজেদেরকে তাঁর অনুসারী হিসেবেই প্রকাশ করেন। কিন্তু কোথায় ইবনে তাইমিয়া রহ.এর ইলম ও ফিক্‌হ, তাক্‌ওয়া ও ইনসাফপ্রিয়তা, আর কোথায় তাঁর ভক্ত-অনুরক্ত গায়রে মুকাল্লেদ বন্ধুবর্গ!!

সবশেষে যে প্রশ্নটি বাকি থাকে তা হল, যখন উভয় পন্থাই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং উভয় পন্থাই সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে প্রচলিত ছিল তো হানাফী ফকীহগণ প্রথম পদ্ধতিটিকে (যেখানে দুই রাকাআতে অতিরিক্ত তাকবীর সর্বমোট ছয়টি) উত্তম বলছেন কেন? এর জবাব হল, এ পদ্ধতিটিকে উত্তম বলার অনেক কারণ আছে। যথা ঃ

১. হাদীস শরীফে এই পন্থাটি অত্যন্ত তাকিদ ও গুরুত্বের সাথে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে এ পন্থা অনুযায়ী নামায পড়েছেন শুধু তা-ই নয়, নামায শেষে আবার মৌখিক আলোচনার মাধ্যমেও পদ্ধতিটি শিখিয়ে দিয়েছেন। ইরশাদ করেছেন, তোমরা ভুলে যেয়ো না। এরপর হাতের অঙ্গুলি তুলে দেখিয়ে দিয়েছেন তাকবীরের সংখ্যা কয়টি হবে।

২. এ পদ্ধতি যে হাদীসগুলোতে বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর সনদ অন্যান্য পদ্ধতির হাদীসগুলোর সনদের চেয়ে অধিক সহীহ ও শক্তিশালী।

৩. প্রবীণ ও বড় বড় সাহাবীর আমল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই পন্থা অনুযায়ী ছিল। তাঁদের এক বড় জামাআত থেকে এ পদ্ধতিটিই বর্ণিত হয়েছে।

গায়রে মুকাল্লেদ ভাইদের এই দাবি যে, খুলাফায়ে রাশেদীন অন্য পদ্ধতিটি (বারো তাকবীর) অনুসরণ করেছেন, তা ঠিক নয়। কেননা, তারা যে বর্ণনার ভিত্তিতে এই দাবিটি করেন একে তো তার সনদ বা সূত্র 'মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন।) দ্বিতীয়ত সেই সনদে ইবরাহীম আলআসলামী নামীয় এক ব্যক্তি আছে যে মাতরূক (পরিত্যাজ্য)। এমনকি তাকে কায্‌যাব (মিথ্যাবাদী)ও বলা হয়েছে।

উপরোক্ত তিনটি কারণ ছাড়া আরো বিভিন্ন কারণে এই পদ্ধতিটি উত্তম, যার বিস্তারিত বিবরণ ফিক্‌হের দলীলবিষয়ক বড় বড় কিতাবে রয়েছে।

এই সব আলোচনা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই মাসআলায় গায়রে মুকাল্লেদ ভাইদের সাথে আমাদের মতভেদ এই জায়গায় নয় যে, তারা যে পদ্ধতিটি

কোন কোন ইমামের তাকলীদ করে প্রাধান্য দিয়েছেন অর্থাৎ বারো তাকবীরের পদ্ধতি, তা ভুল বা খেলাফে সুন্নত। তাদের উপর আমাদের আপত্তি হল, তারা নিজেদের অবলম্বিত পদ্ধতিটিকেই একমাত্র মাসনূন পদ্ধতি বলে থাকেন এবং অত্যন্ত লজ্জাজনকভাবে এই দাবি করেন যে, হানাফীরা যে পদ্ধতিতে ঈদের নামায পড়ে তার প্রমাণে না কোন সহীহ হাদীস আছে, আর না কোন সাহাবীর আমল। তাদের পদ্ধতিটি একটি ভিত্তিহীন ও খেলাফে সুন্নত পদ্ধতি। নাউযুবিল্লাহ মিন-যালিক।

তাদের এই উভয় দাবি একদম ভুল। কেননা, তাদের অবলম্বিত পন্থাটি ঈদের নামাযের একমাত্র পন্থা নয়। একাধিক জায়েয পন্থার একটি। তার বিপরীতে শীর্ষস্থানীয় সাহাবী ও তাবেয়ীগণের অধিকাংশই যে পন্থাটি অবলম্বন করেছেন এবং যা দলীলের বিচারেও অগ্রগণ্য আমরা তা-ই অবলম্বন করেছি।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম জাতিকে সঠিক বুঝ দান করুন এবং প্রতিটি মতভেদকে তার নির্ধারিত সীমার মধ্যে রাখার তাওফীক দান করুন। মাসাআলা-মাসায়েলের যে ইখতেলাফ শরীয়তের দৃষ্টিতে অনুমোদিত ও সমর্থিত তার মাধ্যমে নিজেদের ঐক্য ও শক্তিমত্তাকে বিনষ্ট করা থেকে নিরাপদ রাখুন, আমীন।

ভাষান্তর ঃ মাওলানা যাকারিয়া আব্দুল্লাহ